
আমার চলা
B.B.

চরৈবেতি, চরৈবেতি—চলো পথিক, অবিশ্রান্ত চলো

—ঋগ্বেদ

বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু

—বিবেকানন্দ

চলিয়া তোমার সাথে—মুক্তি পাই চলার সম্পদে

—রবীন্দ্রনাথ

আগে চলো

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন

মডেল পাবলিশিং হাউস
২-এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৯

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫০

বোর্ড বাঁধাই

মূল্য এক টাকা আট আনা মাত্র

মডেল পাবলিশিং হাউসের পক্ষ হইতে শ্রীসুনীতিকুমার মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী-শ্রী প্রেস, ৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোডএর পক্ষ হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

আগে চলো

জাগো

ভগবান এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন জাগরণের মন্ত্র গাহিয়া। চরাচর অখিল প্রকৃতির মধ্যে সেই মন্ত্র অনবরত ধ্বনিত হইতেছে। জাগো, জাগো—চলো, চলো—বিকাশের পথে, উন্নতির পথে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হও—ইহাই সেই মন্ত্রের মর্মবাণী। এই বাণী যে শুনেনা, মানেনা তাহাকে মরিতে হয়—এ সংসারে তাহার স্থান নাই। যে শুনে সে বাঁচে—দুঃখ দৈন্য অজ্ঞানকে জয় করিয়া সে জীবনকে মহৎ করে, জ্ঞানোজ্জ্বল করে, সার্থক করে।

প্রভাতের ফুটন্ত ফুলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়াছ কি? বর্ণে, গন্ধে, লাবণ্যে সে যে স্নিগ্ধ, প্রাণ-জুড়ানো আকর্ষণ বিস্তার করিয়াছে তাহা কিরূপে সম্ভব হইল একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ফুলের ঐ সার্থক বিকাশের পিছনে ছিল ফুটিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সে যখন কুঁড়ি ছিল সকলের অলক্ষ্যে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কি ব্যাকুল আগ্রহে তিল তিল করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে—তাহা জান কি? ঘুমাইয়া

ঘুমাইয়া সে কখনও ফুটিতে পারিত না। তাহাকে সাধিতে হইয়াছে অনবরত জাগরণের মন্ত্র।

সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ। এই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের অধীশ্বর তিনি। তাপ, আলো, জীবনীশক্তি অকাতরে বিলাইয়া আশ্রিত গ্রহাদি এবং তাহাদের পৃষ্ঠের সমস্ত প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। যে মহৎ সেবাকার্যের ভার তাঁহার উপর পরিন্যস্ত, যুগ যুগ ধরিয়া হাসিমুখে তাহা সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন।

নদী উদ্দাম বেগে সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—সাগরে মিশিয়া তবে তাহার ক্ষান্তি। জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে, পুঞ্জে পুঞ্জে জমিয়া মেঘ হইতেছে, আবার সময়ে ফাটিয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। এই চক্র-গতিই জলের জীবন-ছন্দ। যে জল সেই ছন্দকে উপেক্ষা করে সে নর্দমার পঙ্কে গুমরাইয়া মরে, রুক্ষ বালুকাস্তরে শোষিত হইয়া দুঃখী বন্দীজীবন যাপন করে।

পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ—ইহারাও জীবনছন্দে নাচিয়া নাচিয়া আগে চলিয়াছে। নিরলস উদ্যমে আহার সংগ্রহ করিয়া, বাসস্থান বাছিয়া লইয়া, সন্তান-সন্ততি বিস্তার করিয়া জীবনের যতটুকু সার্থকতা তাহার এলাকার মধ্যে আছে তাহা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

মানুষকেও চলিতে হইবে। তাহার পথ কিন্তু দূর—দূর—

বহুদূর বিস্তৃত। ভগবান তাহাকে বুদ্ধি দিয়া, বিবেক দিয়া সৃষ্টির অপর জীবজন্তু হইতে অনেক বেশী কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার চলিবার রাস্তাও বিপুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহাকে শুধু খাইয়া, ঘুমাইয়া, দেহের আরাম খুঁজিয়া বাঁচিলে চলিবে না। নিজের এবং সন্তানসন্ততিদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা লাভ করিয়াই তাহার চলা ফুরায় না। এ তো তুচ্ছ এক ধাপ মাত্র। আরও সহস্র ধাপ তাহাকে উঠিতে হইবে।

লক্ষ্য করিতে হইবে তাহাকে মনের দিকে, হৃদয়ের দিকে, চরিত্রের দিকে। নিজের এবং নিজের পোষ্যবর্গের কথা ভাবিবার পর ভাবিতে হইবে তাহাকে সমাজের কথা, দেশের কথা, বিশ্বের কথা। ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ভাঙিয়া বহুজনের হিতের জন্য নিজকে দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে।

মানুষের মন যেন একটি বিরাট খনি। কত রত্ন যে সেখানে লুকানো আছে ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মনরূপ আকর খুঁড়িয়া তুলিতে হইবে বহুমূল্য সম্পদরাশি—কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান—কত রকমের বিদ্যা, কত বিচিত্র জ্ঞানসম্ভার।

মানুষের হৃদয় যেন এক মহাসমুদ্র। ইহা মন্থন করিয়া উঠাইতে হইবে মণিমাণিক্যরাজি—সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, সেবা, ন্যায়, ধর্ম- -কত সুন্দর অনুভূতি—কত আশ্চর্য ভাবসমূহ।

মানুষের চলিবার, বড় হইবার যেন কোন সীমা নাই। তাহার দেহটি সাড়ে তিন হাত মাত্র। দেহের দিক দিয়া বিচার করিলে প্রকৃতির অসংখ্য প্রাণী ও বস্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান—একথা সত্য। ঐ খরস্রোতা তটিনী তোমার রক্ত-মাংসের শরীরটি নিমেষে চুরমার করিয়া দিতে পারে—সাগরের ঐ বড় বড় ঢেউএর একটিই তোমার ক্ষুদ্র দেহটিকে এক মুহূর্তে তাহার অতল গর্ভে বিলীন করিয়া দিতে পারে। পাহাড়ের গায়ে ঐ যে বৃহৎ শিলাখণ্ডটি ঝুলিয়া আছে, অতর্কিতে তোমার ঘাড়ে পড়িয়া চোখের পলকে তোমাকে পিশিয়া মারিতে পারে। বাঘ, হাতী, গণ্ডার, ভল্লুক এই সকল জন্তুর দৈহিক বলের তুলনায় মানুষের শরীরের ক্ষমতা আর কতটুকু? কিন্তু মানুষের বল তাহার দেহে নয়—মানুষের বল তাহার বুদ্ধিতে, তাহার বিবেকে, তাহার হৃদয়ের বিচিত্র ভাব-সম্পদে। হউক না তাহার দেহ সাড়ে তিন হাত—বুদ্ধি বলে সে যে প্রকৃতির সম্রাট্। জ্ঞানের বলের তুলনায় শারীরিক বল কত তুচ্ছ! তাইতো মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি আজ দূর আকাশে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলের রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে, গভীর সমুদ্রের তলদেশে দুর্জ্ঞেয় তথ্য-গুলি অতি পরিচিত বিষয়ের মত নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার সূক্ষ্ম গবেষণাশক্তি জড়পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া অণু-পরমাণু, বিদ্যুতিনের (electron) এলাকায় পৌঁছিয়া কি বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ আবিষ্কার করিয়াছে। প্রকৃতির কত রকমের শক্তি

দিন দিন মানুষ তাহার আয়ত্তের মধ্যে লইয়া আসিতেছে। জড়জগৎই বল আর প্রাণিজগৎই বল সাড়ে তিন হাত মানুষটির কাছে সকলেই হার মানিয়াছে।

আবার হৃদয়ের সম্পদ বাড়াইয়াও মানুষ কত বড় হইতে পারে। হইতে পারে সে রাম, সীতা, কৃষ্ণ—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ—চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—অশোক, লেনিন, গান্ধী। তাহার জ্ঞানের আলোকে, প্রেমের প্রভায়, চরিত্রের মাধুর্যে জগৎ মুগ্ধ হইয়া যায়। মানুষ তখন আর মানুষ নয়—সে হইয়া যায় দেবতা, ভগবান।

হাজার হজার বৎসর আগে—সেই দূর বৈদিক কালে মানুষ প্রথম তাহার নিজের বড় হইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল। কত বড়? **জ্যায়ান্ পৃথিব্যা, জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবো, জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।**"* সসাগরা পৃথিবীর চেয়ে বড়, অনন্ত আকাশমণ্ডলের চেয়ে বড়, স্বর্গলোকের চেয়ে বড়, অখিল সৃষ্টি সংসারের চেয়ে বড়। মানুষ ঠিক ঠিক অনুভব করিয়াছিল বড় হইবার এতই ক্ষমতা তাহার ভিতর আছে।

বাংলা দেশের অমর কবি চণ্ডীদাস এই বৈদিক আবিষ্কারেরই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছিলেন—

শুনরে মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্

জাগো

ক্ষুদ্রকায় মানুষের ভিতর অনন্ত বৃহৎ ঘুমাইয়া আছে। সেই বৃহৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, জাগাইয়া রাজসিংহাসনে বসাইতে হইবে, মানুষের মহিমা দিগদিগন্তে ঘোষণা করিতে হইবে। মূঢ় মানুষ নয়, হিংস্র মানুষ নয়, পশু মানুষ নয়—জ্ঞানী মানুষ, প্রেমিক মানুষ, দেব-মানুষ।

জাগো তরুণ জাগো। ফুলের মত ফুটিয়া ওঠো—সূর্যের মত জ্যোতির্ময় হও—মুক্ত তটিনীর মত দুর্নিবার বেগে লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলো। দূর হউক আলস্য, দূর হউক দুর্বলতা, দূর হউক ভয়। জাগুক বুক-ভরা উৎসাহ, অধ্যবসায়, অকপট চেষ্টা।

চলো, চলো—আগে চলো।

আদর্শ বাছিয়া লও

এক এক জন মানুষ এক এক রকমের শারীরিক গঠন, মনের ধারা লইয়া পৃথিবীতে আসে। চলিবার পথও তাই সকলের পক্ষে আগাগোড়া এক হইতে পারে না। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি সাধারণ আদর্শ আছে—সেগুলি অর্জন করিতে প্রত্যেককেই চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত আদর্শ বহু জনের বহু প্রকার হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

খুব ছেলেবেলা হইতেই কাহারও কাহারও একটা নির্দিষ্ট আদর্শের দিকে বেশী রকম ঝোঁক দেখা যায়। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বাল্যকাল হইতেই জীবের প্রতি করুণাসম্পন্ন, খেলাধুলা আমোদআহ্লাদে বিরক্ত, আনমনা। বালক সিদ্ধার্থের এই বৈশিষ্ট্যগুলিই পরে বুদ্ধের অসীম করুণা, ত্যাগ ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইয়া সারা জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, আশুতোষকে বাল্যকালে দেখিয়াই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ মনীষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমভাগ পড়েন, দেখা যায়, তখনই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই লাইনটি ধরিয়া কাব্যের ছন্দ অভ্যাস করিতেছেন। কিশোর নরেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে সহজেই ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দের ছবি কল্পনা করা যায়। গ্রামোফোন, টেলিগ্রাফ, বায়োস্কোপের

মেশিন প্রভৃতি যাঁহার গবেষণা হইতে সম্ভবপর হইয়াছে সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন যখন চারি বৎসরের শিশু তখন ঘোড়ার গাড়ীর চাকা কেমন করিয়া ঘুরিতেছে তাহা নিরূপণ করিতে ব্যস্ত। বর্তমান তুরস্ককে যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই মুস্তাফা কামাল তরুণ বয়স হইতেই নেতা, সংগঠক। কাহারও আবার ছোটবেলা দেখিয়া মোটেই বুঝা যায় না সে কোন্ পথে যাইবে। তরুণ রত্নাকরকে দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল মহাকবি বাল্মীকি হইবার যোগ্যতা তাহাতে বর্তমান? যে যুবক কাষ্ঠসংগ্রহে গিয়া একটি বৃক্ষশাখায় বসিয়া সেই শাখারই মূলদেশ ছেদন করিতে-ছিল, সে যে কালে বাণীর বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস হইবে, তাহা কে বলিতে পারিত? বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন একটি আফিসে কেরাণীগিরি করিতেন। তখন কে জানিত তাঁহারই মাথা হইতে বিশ্ব-আলোড়নকারী বৈজ্ঞানিক তথ্য বাহির হইবে।

তরুণ বয়সেই একটি পছন্দমত উচ্চ লক্ষ্য বাছিয়া লইতে পারিলে জীবনের গতি সহজ ও সুন্দর হয়। বড় হইবার, মনুষ্যজীবনকে ঠিক ঠিক বিকশিত করিবার অনেক রাস্তা আছে। স্থির করিয়া লও, তুমি কোন পথে যাইবে। তুমি কি বৈজ্ঞানিক হইবে না সাহিত্যিক, অথবা সৈনিক? শিক্ষাব্রত লইয়া জীবন কাটাইবে, না ডাক্তারি করিবে? তোমার কর্মকেন্দ্র ফ্যাক্টরী, না শাসন-পরিষদ? তুমি ছবি আঁকিবে, না গান গাহিবে?

বিভিন্ন আদর্শ এক সঙ্গে মনকে টানিয়া অনেক সময় দ্বন্দ্ব বাধায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দেখিয়া সাধ হয় কবিতা লিখি—আবার মাদাম কুরীর * বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা পড়িয়া ইচ্ছা করে কোন কিছু একটা আবিষ্কার করি। কখনও ঝোঁক হয় প্রতাপসিংহ, শিবাজীর ন্যায় বীর যোদ্ধা হই, কখনও বা প্রাণে সাধ জাগে কবীরের মত, মীরাবাই-এর মত ভগবানের নাম গুণ গান করিয়া কাল কাটাই।

যে কবিতা ভালবাসিবে তাহার যে বিজ্ঞানে ঝোঁক থাকিবে না তাহা নয়, যে সৈনিক হইবে তাহার ভগবানে ভক্তি থাকা দূষনীয় নয়—তবুও জীবনের প্রধান আদর্শ কী, তাহা পরিষ্কার-রূপে ঠিক করিয়া লওয়া ভাল। সেই প্রধান আদর্শকে সকল শক্তি দিয়া আঁকড়াইয়া ধর—জীবনে উহা যতটা পার ফুটাইয়া তোল—তাহার পর ঐ পথে যতদূর পার আগাইয়া যাও।

একটি জ্বলন্ত উদাহরণ সামনে দেখিতে না পাইলে আদর্শ ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়ে। মানুষের জীবন হইতেই মানুষ শিখে, বল পায়। শুধু যদি শুনিয়া যাই সত্যের মহিমা বিপুল, সত্যপালন দ্বারা বড় হওয়া যায়, তাহা প্রাণে ঠিক ঠিক উদ্দীপনা জাগায় না। তোতাপাখীর মত রাম নাম পড়িয়া যাওয়াই সার হয়। কিন্তু যদি সম্মুখে দেখি শ্রীরামচন্দ্রের জীবন, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের জীবন, মহাত্মা গান্ধীর জীবন তাহা হইলে সত্য-

* রেডিয়ামের আবিষ্কর্ত্রী বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মহিলা বৈজ্ঞানিক।

পালনের শিক্ষা প্রাণে গভীরভাবে গাঁথিয়া যায়। একশত পুস্তক পড়িলে যে ফল না হয়, জীবনের উদাহরণ দেখিলে তাহা অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

পুঁথির উপদেশ পড়িয়া দেশ সেবক হওয়া যায় না। কিন্তু যদি ভাবি পৃথ্বীরাজের কথা, নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী, খুদিরাম-তিলক-চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রের কথা, স্বতঃই হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে!

অতএব বিভিন্ন পথ দিয়া যাঁহারা মহত্ব লাভ করিয়াছেন, মনুষ্যত্বকে সার্থক করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন অনুশীলন কর। ইঁহারাই মানুষের পথপ্রদর্শক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইঁহাদের মনীষা, অধ্যবসায়, কর্মশক্তি, চরিত্রবল, স্বার্থত্যাগ, তেজস্বিতা মানুষকে আশা দিয়াছে, উৎসাহ দিয়াছে—জীবনকে উচ্চতর লক্ষ্যে চালিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখ, কত পুরুষশ্রেষ্ঠ, কত নারীরত্ন—রামকৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-মহম্মদ-শঙ্কর-রামানুজ-চৈতন্য - কবীর - নানক - রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ: সীতা-সাবিত্রী-শৈব্যা-রাবেয়া-মীরাবাই; অশোক-আকবর-পিটারদিগ্রেট্-ভিক্টোরিয়া-অহল্যাবাই-রাণীভবানী; কপিল-কণাদ-ব্যাস-গৌতম-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য-সক্রেটীস-টলষ্টয়; গার্গী-মৈত্রেয়ী-খনা -লীলাবতী -ফ্লোরেন্সনাইটিঙ্গেল- জোয়ান্- অব-আর্ক, আরও কত, আরও কত। অসংখ্য উজ্জ্বল চরিত্র বিভিন্ন দেশে,

বিভিন্ন সময়ে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। সম্ভ্রমে ইঁহাদের উদ্দেশ্যে মাথা নত কর, ইঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ কর—পরে ভাবিয়া দেখ ইঁহাদের মধ্যে কে কে তোমার হৃদয়কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁহারাই তোমার আদর্শ। তাঁহাদের পথই তোমার পথ। তাঁহাদের জীবনের আলোকে তোমার জীবনবর্তিকাটি জ্বালিয়া লও। তাহার পর নির্ভয়ে সেই নির্বাচিত পথে অগ্রসর হইয়া চল।

আদর্শ নির্ণয় করিবার সময় চাই খুব ধীরতা—চাই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা। অনেক সময় উৎসাহের আবেগে আমরা একটা ভুল আদর্শ গ্রহণ করিয়া বসি। সূর্য শক্তিমান, আবার বজ্রও শক্তিমান। কিন্তু দুয়ের শক্তির প্রকাশে ও প্রয়োগে কত তফাৎ। সূর্য অনন্ত ধৈর্য ও প্রশান্তি লইয়া জগতের কল্যাণের জন্য নিজের শক্তি নিয়োগ করেন—বজ্র উচ্ছৃঙ্খল দর্পে পৃথিবীর উপর হঠাৎ ফাটিয়া পড়িয়া শুধু ধ্বংস সাধন করিয়া অদৃশ্য হয়। শক্তিমান হইলেই যে মহৎ হয় তাহা নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। রাবণ-দুর্যোধন-চেঙ্গিস্‌খাঁ-সুলতানমামুদ—ইঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন—কিন্তু ইঁহাদিগকে বড় বলিব না। ইঁহাদের বলবীর্যের পশ্চাতে ছিল লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা। শক্তিমান পুরুষ হইলেও ইঁহারা আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। মানুষকে জ্ঞান ও শান্তির পথে লইয়া যাইতে ইঁহাদের জীবন কোন শিক্ষাই দেয় না। বর্তমান যুগের

হিটলারের কথা ভাবিয়া দেখ। তাঁহার অমিত তেজোবীর্য, সাহস, অধ্যবসায়, লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে কেহ সংশয় প্রকাশ করে না। তবুও তাঁহাকে আদর্শ মানুষ বলিতে পারি না। কারণ নিজের জাতির সুখ এবং সমৃদ্ধির জন্য তিনি অন্যান্য দুর্বল জাতিকে নিপীড়িত করিতে চাহিয়াছিলেন।

অপরের সর্বনাশ করিয়া বড় হওয়া কখনই আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে রন্তিদেব নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার নিত্যকার প্রার্থনা ছিল—"জগতের সকল প্রাণীর দুঃখ নিজে সহ্য করিয়া যেন তাহাদিগকে সুখী করিতে পারি।" কি সুন্দর আদর্শ!

অতএব বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়া যাইও না। আদর্শ বাছিবার সময় সাবধান। কাচখণ্ডকে হীরক বলিয়া ধরিয়া লইও না। সাময়িক উত্তেজনায় যাহার তাহার কাছে মাথা বিকাইয়া সারা জীবন যেন পস্তাইতে না হয়। বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—

> **যেথা যে অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে,**
> **জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।**

এই 'অমৃতধারার'ই সন্ধান করিতে হইবে। যে কোন জলে পিপাসা মিটাইতে যেন না যাই। জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যাহা মহান, যাহা কল্যাণকর তাহাই আদর্শ, তাহাই বরণীয়।

কথা ও কাজ

একটি আদর্শকে মানিয়া লওয়া, আর ঐ আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করা এই দুয়ে অনেক পার্থক্য। কথা বলা সহজ কিন্তু কাজ করা কঠিন। ডিবেটিং ক্লাবে গান্ধিজীর পক্ষ নেওয়া বা নেতাজীকে সমর্থন করা এক জিনিষ আর নিজের জীবনে গান্ধিজী বা নেতাজীর একটি মাত্র বাণী পালন করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমাদিগকে কথা ছাড়িয়া কাজ করিতে হইবে। ভাসাভাসা, উপরউপর ভালবাসায় হইবে না—প্রাণে প্রাণে আদর্শকে ভালবাসিতে হইবে। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ঐ আদর্শের জন্য খাটিতে হইবে; আলস্য, আরামপ্রিয়তা, অনবধানতা ত্যাগ করিয়া নিজকে উহার ছাঁচে গড়িতে হইবে।

যদি বৈজ্ঞানিক হওয়াই নিজের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাক তো অভ্যাস কর প্রখর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, অটল ধৈর্য, অদম্য অধ্যবসায়, দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। খুঁটিনাটি তুচ্ছতম ঘটনাটিও যেন তোমার চোখ এড়াইয়া না যায়। কে জানে ঐ তুচ্ছ ঘটনাটির মধ্যেই হয়তো প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্য আচ্ছাদিত আছে। দিনের পর দিন একটি পরীক্ষা লইয়া লেবরেটরীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া যাইতেছ—আকাঙ্ক্ষিত তথ্যের কোন সন্ধান মিলিতেছে না—তবুও হতাশ হইলে চলিবে না। বার বার একটি

পরীক্ষা হয়তো বিফল হইয়া যাইতেছে—আবার আশায় বুক বাঁধিয়া নূতন করিয়া উহা আরম্ভ করিতে হইবে। 'আর পারি না' বলিলে বিজ্ঞানের রাস্তায় চলা যায় না। কোন একটি পরীক্ষার পর ফলের অঙ্ক যাহা হওয়া উচিত তাহা তোমার হয় নাই—কিছু কম বা বেশী হইয়াছে। তুমি তোমার নিজের পরীক্ষার ত্রুটি ঢাকিতে গিয়া যে উত্তর পাইয়াছ তাহা লিপিবদ্ধ করিলে না, বই অনুসারে যাহা হওয়া উচিত তাহাই বসাইয়া দিলে। এই মিথ্যাচরণ বিজ্ঞানের রাজ্যে উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ করে। অল্পায়াসে প্রশংসা পাইতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি বিজ্ঞান সাধনা তাহাদের জন্য নয়। তাহারা বিজ্ঞানকে মুখে ভালবাসিয়াছে, প্রাণে প্রাণে উহাকে বরণ করে নাই। গেলিলিও, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—ইঁহাদের জীবনী পড়িয়া দেখ বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার এবং প্রচারের জন্য ইঁহাদিগকে কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা, কত সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবুও তাঁহারা সত্যকে নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাই বৈজ্ঞানিকের আদর্শ।

কবি হওয়া, লেখক হওয়াও কথা মাত্র নয়—কাজ। উহার জন্য দরকার হইবে ভাবুক হইতে শিখা, প্রকৃতিকে ভালবাসিতে, জীবজন্তু মানুষকে আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারা, শব্দসম্পদ অর্জন করা। কঠিন সাধনা।

দেশ সেবক হওয়াও সহজ কথা নয়। দেশকে চিনিতে

হইবে—দেশের জন্য স্বার্থ সুখ মান অপমান বিসর্জন দিতে হইবে—কঠিন দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করিতে হইবে। দেশসেবা সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার নয়—অক্লান্ত সাধনার বিষয়।

শিল্পী হইতে গেলে, ব্যবসায়ী হইতে গেলেও শিখিতে হয়, খাটিতে হয়। অলস স্বপ্ন দেখিয়া কার্য সিদ্ধ হয় না। কঠিন বাস্তব জগতে কল্পনা-বিলাসীর কোন স্থান নাই।

জীবনে উচ্চ আদর্শ যাহারা বরণ করিয়া লইয়াছে, যাহারা নিজেরা বড় হইবে, দেশকে গৌরবান্বিত করিবে তাহাদের পথ আলাদা। তাহারা কথা বলিবে কম, কাজ করিবে বেশী। যাহা বলিবে, তাহা করিবে। খেলাধুলার সময়, হাসিতামাসার সময় খেলিবে, হাসিবে—কিন্তু কাজের সময় তাহারা অভ্যাস করিবে অখণ্ড মনোযোগ, স্থিরতা, শ্রদ্ধা। গভীর একাগ্রতা, আগ্রহ এবং যত্ন লইয়া তাহারা আদর্শকে একটু একটু করিয়া সফল করিয়া তুলিবে নিজেদের জীবনে। তাহারা কর্মী, তাহারা সৈনিক।

বড় হইবার কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা নাই। যে আদর্শ লইয়া বড় হইতে চাও, তাহার উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ধৈর্য সহকারে আয়ত্ত কর। কি ভাবে চলিলে বড় হওয়া যায়, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে জানিয়া সেইভাবে চলিতে থাক—একদিন নিশ্চয়ই বড় হইবে। সব ধাপগুলি একে একে তো অতিক্রম করা চাই। সময় লাগিবে, পরিশ্রম হইবে কিন্তু অন্য উপায়ও নাই।

শরীরং মে বিচর্ষণম্

প্রাচীনকালে তপোবনে ঋষিদের আশ্রমে থাকিয়া যখন বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তখন ঋষিরা ছাত্রগণকে সর্বপ্রথম এই প্রার্থনাটি শিখাইতেন—আমার শরীর যেন দৃঢ় করিতে পারি, সুন্দর, শ্রমসহিষ্ণু, কর্মদক্ষ করিতে পারি—শরীরং মে বিচর্ষণম্। এই উক্তিটি বেদের একটি অংশ—তৈত্তিরীয় উপনিষদের।

জ্ঞানী ঋষিরা জানিতেন জীবনের যে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে গেলে শরীরকে মজবুত করিতে হইবে—তাই যত্নে বিদ্যার্থিগণকে শরীর পালনের নিয়মগুলি শিখাইতেন। শরীর নীরোগ, সবল থাকিলে মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা, আত্মার শিক্ষা লাভ করা সহজ হয়। দুর্বল রোগগ্রস্ত ব্যক্তি উচ্চচিন্তা ধারণা করিতে পারে না। উচ্চ আদর্শ অনুশীলন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। উপনিষদেরই আর একটি কথা আছে—**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ**—হীনবীর্য লোক উচ্চতম সত্য লাভ করিতে পারে না। আর একটি বাণী—"**আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী।**" অর্থাৎ আদর্শ মানুষের থাকা চাই বজ্রদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ হওয়া চাই তাঁহার মেধা, 'সমস্ত বিশ্বকে শাসন করিতে পারি' এমন তেজ তাঁহার সঞ্চিত করা চাই।

পরীক্ষা পাশ করিবে পরে; কবিতা লেখা, বক্তৃতা করা সা-রে-গা-মা সাধা এসবও আপাততঃ অপেক্ষা করুক—কিন্তু শরীরকে সতেজ সবল রাখিবার জন্য যাহা কিছু করা দরকার তাহা আর এক মুহূর্তও ফেলিয়া রাখিও না। আগে চলার ইহাই আদি সোপান। বিবেকানন্দের এই কথাটি স্মরণ করো—"গীতা-পাঠের অপেক্ষা ফুটবল খেলিয়া তোমরা ভগবানের দিকে বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে।" এই উক্তি দ্বারা বিবেকানন্দ ইহা বলিতে চান নাই যে গীতা পড়া খারাপ। তাঁহার বলার উদ্দেশ্য শরীরে শক্তি না হইলে গীতার তেজঃপূর্ণ অভয়বাণী ধারণা করা কঠিন।

হাতের উপর হাত বুকে রাখিয়া সিংহবিক্রমে দাঁড়ানো বিবেকানন্দের সেই বীরবেশী ছবিটি দেখিয়াছ কি? ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় বাছাবাছা পণ্ডিত এবং হাজার হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া তিনি সদর্পে ভারতীয় ধর্মের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কি সুঠাম সবল আকৃতি, কি তেজস্বী চেহারা! দেখিলে হৃদয়ে উৎসাহ আসে, সাহস আসে—উদ্দীপনা জাগে। বিবেকানন্দ যদি রোগাপটকা মিনমিনে বাবাজী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ধর্মপ্রচারে শ্রোতৃবর্গের উপর সিকিভাগও ফল হইত কি-না সন্দেহ।

বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্মনেতা, দেশপ্রেমিক, পণ্ডিত, বক্তা—কিন্তু শরীরকে তিনি অবহেলা করেন নাই। শরীর-রূপ কাঠামোর উপরই মনুষ্যত্বের সুন্দর প্রতিমা গড়িতে হয়—একথা তিনি প্রাণে

প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—তাই তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরব—ছেলেমেয়েদের শারীরিক শক্তি অর্জন করিতে বার বার বলিতেন।

শরীরং মে বিচর্ষণম্—এই বেদবাক্যটিকে আমরা যেন ভুল বুঝিয়া না বসি। ইহা জীবনের পূর্ণতম আদর্শ নয়—উচ্চতর লক্ষ্যকে পাইবার একটি উপায় মাত্র। চলিতে হইবে আমাদিগকে দূর, দূর—বহুদূর—মনের রাজ্যে—হৃদয়ের রাজ্যে—মনুষ্যত্বের, দেবত্বের রাজ্যে। নীরোগ, সবল, শ্রমসহিষ্ণু দেহ—সেই চলিবার পথে প্রধান সহায়ক। এইজন্যই শরীরের যত্ন লইব—উহাকে গড়িয়া তুলিব। কিন্তু শরীরই যেন আমাদের সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করিয়া না বসে। শরীরের যতটুকু ন্যায্য দাবী ততটুকুই তাহাকে দিতে হইবে—তাহার বেশী নয়। আমরা যেন শরীর-সর্বস্ব না হই। ভারতের আদর্শ তাহা নয়।

অন্তরের পুষ্পোদ্যানে

এইবার চল অন্তরের দিকে নজর দিই। অন্তরের দুটি দিক—মন ও হৃদয়। আরও একটি দিক আছে—আত্মা। সে প্রসঙ্গ পরে হইবে। যাহা দ্বারা চিন্তা হয়, বিচার হয়, আলোচনা-গবেষণা হয়, পরিশেষে কোন একটি বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হয়—তাহাই মন। জ্ঞান উপার্জনের প্রধান যন্ত্র মন। মনের শক্তি অনেক। প্রত্যেকটি শক্তিই আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করে।

যেখানে সুখদুঃখ, ভালবাসা, ঘৃণা, আশাউল্লাস প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগরাশি উৎপন্ন হয়—সেইটি হৃদয়ের এলাকা। হৃদয়েরও বহু বিচিত্র শক্তি—প্রত্যেকটি শক্তিই আমাদের জীবনের উপর বহুল প্রভাব বিস্তার করে।

হৃদয় ও মন প্রায়ই এক সঙ্গে মিলিয়া কাজ করে—একেবারে পরস্পর আলাদা হইয়া চলে না। উহাদের শক্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি শুভ, আবার কতকগুলি অশুভ। শুভ শক্তিগুলিই আমাদের অন্তরের অমূল্য সম্পদ। ঐগুলিকে সযত্নে অনুশীলন করিতে হয়—উহাদিগকে পরিপুষ্ট করিতে হয়—তবেই মানুষ আগে চলিতে পারে, সকল মলিনতা, ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞানকে দূর করিয়া জীবনকে আনন্দময়, জ্ঞানময়, কল্যাণময় করিতে পারে।

অশুভ শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিলে মানুষ দিন দিন অবনতির দিকে নামিয়া যায়—যে হইতে পারিত আদর্শ মানুষ, দেব-মানুষ —সে পরিণত হয় নিন্দিত মানুষে, পশু-মানুষে। তবে একথা সত্য যে, চেষ্টাযত্ন দ্বারা অশুভ শক্তিগুলিকেও সৎ-দিকে পরিচালিত করিয়া উহাদের প্রকৃতি বদলাইয়া ফেলা যায়। তখন আর উহারা আমাদের শত্রু নয়—মিত্র। তখন উহাদিগকে আমরা আমাদের জীবনের উন্নতিকর কাজে লাগাইতে পারি। উহারা তখন ভৃত্য হইয়া আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করে।

এখন আমরা অন্তরের কতকগুলি প্রধান শক্তির বিষয় আলোচনা করিব। এইগুলি অংশতঃ মনের, অংশতঃ হৃদয়ের। এই সম্পদগুলি দিয়া এসো আমরা এক নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান রচনা করি—নিজেরা পরিতৃপ্তি লাভ করিব—বিশ্বজনকেও মুগ্ধ করিব। বাগান করিতে গেলে মাটি কোপাইতে হয়, সার দিতে হয়, চারা পুঁতিয়া বহু যত্নে সেগুলিকে বাঁচাইতে হয়, বাড়াইতে হয়। অন্তরের ফুলবন সাজাইতে গেলেও তাই প্রয়োজন অকুণ্ঠিত পরিশ্রম, অধ্যবসায়—সদা সতর্ক দৃষ্টি—অবিচলিত ধৈর্য, উদ্যম।

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধার সহজ অর্থ—বিশ্বাস ও সম্মান। এই বিশ্বাসের দুটি দিক। একটি নিজের উপর বিশ্বাস—অপরটি বিশ্বাসার্হ ব্যক্তি ও

বিষয়ের উপর। দুটি দিকই প্রয়োজনীয়—দুটি দিকেই আমাদের নজর দিতে হইবে।

বিশ্বাস ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারি না। যখন মাত্র শিশু ছিলাম—ইষ্ট-অনিষ্ট, ভালমন্দ বোধ ছিল না তখন হইতেই বিশ্বাসের ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। মায়ের কথা বিশ্বাস করিয়া জানিয়াছিলাম ইহা খাবার, উহা মাটি—ইহাতে হাত দিতে নাই, আগুন—হাত পুড়িয়া যাইবে—উহাকে ধরিতে নাই, পোকা—কামড়াইবে। মায়ের কথা মানিয়াই চিনিয়াছিলাম উনি বাবা, উনি মামা, উনি কাকীমা, উহারা দাদা, দিদি ইত্যাদি।

আত্মবিশ্বাসও জাগ্রত হইয়াছিল সেই শিশুকালেই। প্রথমে শুইয়া থাকিতাম—পরে কোমর তুলিয়া হামা দিতে শিখিলাম। দাদা-দিদিদের দুপায়ে দাঁড়াইতে, চলিতে দেখিয়া শিশুমনে জাগিল কৌতূহল। উঠিলাম—পড়িয়া গেলাম। বার বার চেষ্টা করিতে করিতে আমিও দাঁড়াইতে সক্ষম হইলাম। বিশ্বাস জাগিল—হাঁ, আমিও পারি। এই বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়াই ক্রমে হাঁটিতে, দৌড়াইতে, খেলিতে শিখিলাম, নিজে নিজে খাইতে, আঁচাইতে, পোষাক পরিতে শিখিলাম, অ-আ-ক-খ, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয়ভাগ পড়িতে লাগিলাম—ক্লাসের পর ক্লাসে উঠিয়া চলিলাম।

মায়ের উপর যে বিশ্বাস ছিল—তাহা আবার প্রসারিত হইয়া চলিল পিতার উপর, দাদার উপর, পিসিমার উপর, গুরুমহাশয়ের

উপর—ক্রমে ভূগোলের উপর, ইতিহাসের উপর, ঘড়িটার উপর, রেলগাড়ীটার উপর। বিশ্বাস না করিলে শিখি কিরূপে, জানি কি উপায়ে, চলি কেমন করিয়া ?

বিশ্বাসের দুই ধারাই এইভাবে পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আজ যেন হঠাৎ উহা থমকাইয়া না যায়। আজ যেন ক্লান্ত হইয়া না বলিয়া উঠি—এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি, আর পারি না। কতটুকু আর আসিয়াছ ? এখনও কতদূর চলিতে হইবে। চলো, চলো আগাইয়া চলো—জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে, উন্নতির পথে। নিজেকে কখনও দুর্বল ভাবিও না। উপনিষদের বাণী মুহুর্মুহু স্মরণ কর—**জ্যায়ান্ পৃথিব্যা, জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ।** ভূলোক, দ্যুলোক, বিশ্বচরাচর—স্তব্ধ হউক তোমার শক্তির বিকাশ দেখিয়া। অনন্ত শক্তি তোমার মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই শক্তিতে শ্রদ্ধাবান হও।

শ্রদ্ধার দ্বিতীয় প্রবাহটিও যেন অবরুদ্ধ না হয়। বলিও না, এতকাল বাবা-মা, মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি, কথামালা, পদ্যপাঠকে মাথা ঠেকাইয়াছি, আর এ সবে প্রয়োজন নাই। আর এখন কাহারো কথা শুনিব না—কোন উপদেশ মানিব না—এখন সাবালক হইয়াছি—মাথা নোয়াইবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এই বুলি বীরের বাণী নয়—আত্মম্ভর মূঢ়ের প্রলাপ। এ প্রলাপ আওড়াইয়া জীবনে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না, অন্ধকার গর্তে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইতে হয়। তোমার এক ছটাক অভিজ্ঞতা,

আধ ছটাক অনুভূতি দিয়া কতটুকু—কী তুমি সংসাধন করিবে ? যাঁহারা জীবনভোর সাধনা করিয়া অগাধ জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছেন, উত্তুঙ্গ কর্মসৌধ নির্মাণ করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে শিখ, তাঁহাদের নিকট বসিয়া, তাঁহাদের লিপিবদ্ধ উপদেশ অনুধাবন করিয়া নিজের হৃদয়-মন, কর্মশক্তি সম্প্রসারিত কর। ইহাই শ্রদ্ধা। ইহাই উন্নতির পথ।

মাঝে মাঝে দুর্বলতা আসিবে। মনে হইবে—না, এত বড় কাজ আমার দ্বারা হইবে না—অসম্ভব। তখন স্মরণ করিও সম্রাট্ নেপোলিয়নকে—যিনি বলিয়াছিলেন—'অসম্ভব' কথাটি মূর্খদের অভিধানের জন্য। তখন ভাবিও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কথা—যিনি সহায়হীন, সম্বলহীন অবস্থায়—শু আত্মশ্রদ্ধা বলে সুদূর আমেরিকায় গিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিজয় পতাকা উড়াইয়া আসিয়াছিলেন। স্মরণ করিও তখন মহাবীর হনুমানকে—তেজস্বিনী নারী সাবিত্রীকে। হনুমান রামকার্য্যের জন্য লাফ দিয়া সাগর ডিঙাইয়াছিলেন, শ্রদ্ধাবতী সাবিত্রী অবলা নারী হইয়াও যমের সহিত বুঝিয়া পতি সত্যবানকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে 'মহাত্মা গান্ধী' করিল কে ?—শ্রদ্ধা। পরাধীন জাতির ক্ষীণদেহ ক্ষুদ্র মানুষটি—দক্ষিণ আফ্রিকায় পরাক্রান্ত দাম্ভিক শ্বেতকায় শাসকজাতির শত হুঙ্কার, শত লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করিয়া অত্যাচার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে

পারিয়াছিলেন কোন্ বলে? শ্রদ্ধা—শুধু আত্মশ্রদ্ধার বলে। সুভাষ ভারতের নেতাজী হইলেন শ্রদ্ধারই সামর্থ্যে।

দুই রকম শ্রদ্ধার প্রভাব এবং কার্যকারিতা উপনিষদের দুইটি উপাখ্যানে অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বালক নচিকেতা পিতার কার্পণ্য এবং মিথ্যাচারণের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহার অভিশাপভাজন হইল। হৃদয়ে জাগিল তাহার শ্রদ্ধা। না, আমি তো অন্যায় কিছু করি নাই—অন্যায় যে আমি করিতেই পারি না। আমি যে উত্তম, শ্রেষ্ঠত্বে যে আমার জন্মগত অধিকার—এই আত্ম-বিকাশ তাহার প্রাণের সকল তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। 'মর তুই'—পিতার এই ক্রুদ্ধ অভিশাপকে সত্য করিতে সে মৃত্যুরাজ যমের ভবনে উপস্থিত হইল। তাহার সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া যম তাহাকে বর দিতে চহিলেন। আবার শ্রদ্ধা মাথা তুলিল। আমি যে বড় হইতে চাই—বড় হইবার ক্ষমতা আমার মধ্যেই আছে—আমি ছোট-খাটো জিনিষ চাহিয়া আমার মনুষ্যত্বের অপমান করিব কেন? তাই সে পৃথিবীর, স্বর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া চাহিল দুর্লভতম ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রদ্ধার জয় হইল। যমের নিকট উহা আদায় করিয়া নচিকেতা মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিল —ঐ বিদ্যা মানুষের কল্যাণের জন্য দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল।

দ্বিতীয় আখ্যান—সত্যকাম জাবালির। গুরু বলিলেন—যাও, বনে গিয়া এই চারি শত গরু চরাও—যখন বাড়িয়া বাড়িয়া

ইহাদের সংখ্যা হাজার হইবে তখন আশ্রমে ফিরিবে—তাহার আগে নয়। যদি পার তবেই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিব। বালক সত্যকামের হৃদয়ে ছিল দ্বিতীয় প্রকারের শ্রদ্ধা—জ্ঞানী, নিঃস্বার্থ, পরহিতব্রতী আচার্যের বাক্যে অচল বিশ্বাস। একটি কথা না বলিয়া এই অদ্ভুত প্রস্তাবের এতটুকুও প্রতিবাদ না করিয়া নতশিরে গুরুর নির্দেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। শ্রদ্ধার অমোঘ ফল ফলিল। গুরুগৃহে ফিরিবার আগেই ব্রহ্মবিদ্যা তাহার অধিগত হইল। জ্ঞানের জ্যোতি মুখ চোখ দিয়া ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গুরু বলিলেন, বৎস নূতন করিয়া তোমাকে আমার শিক্ষা দিবার আর কিছুই নাই, পরীক্ষা শেষ। আপন শ্রদ্ধাবলে তুমি ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছ।

শ্রদ্ধা আনে মনোযোগ। যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই—শিষ্ট জ্ঞানীজনের প্রতি, মহৎ বিষয়ের প্রতি সমাদর নাই—তাহার চিত্ত অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল। মনকে যদি একাগ্র করিতে চাও, চরিত্রে শ্রদ্ধার অনুশীলন কর। নিজের মর্যাদা চিনিয়া লও—অপরকে যথাযথ সম্মান দিতে শিখ। দেখিবে ভাসা-ভাসা মন গুটাইয়া আসিবে—নিজের ভিতর অসীম শক্তির সন্ধান পাইবে—সূক্ষ্ম দুরূহ বিষয়সমূহও সহজে ধরিতে, বুঝিতে পারিবে।

সত্য

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছিলেন—ভগবানকে অনেকে অনেকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমার কাছে

ভগবানের পরিচয়—তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যের মহিমা অবর্ণনীয়। যে নিখুঁতভাবে সত্যপালন করিতে পারে তাহার চরিত্রের বল অজেয়। জগতের কোন শক্তিই তাহাকে দমাইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান তাহার বশে।

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে সত্যকে অতি উচ্চ স্থান দিয়া আসা হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার ইহাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ সত্যের জয়গানে মুখরিত—সত্যব্রত নরনারীর পুণ্যগাথা কীর্তনে ভরপুর। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালনের উপাখ্যান শুনিয়া গান্ধিজী কিশোর বয়সে যে উদ্দীপনা পাইয়াছিলেন সেই উদ্দীপনাই তাঁহাকে সারা জীবনে পথ নির্দেশ করিয়াছিল। সত্য—সত্য—সত্য—ইহাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁহার অহিংস সংগ্রামের নাম দিয়াছিলেন তিনি—সত্যাগ্রহ। রামধূনে যাঁহার নাম তিনি স্মরণ-কীর্তন করিতেন সেই রাম আর কেহই নন—সত্যেরই জীবন্ত মূর্তি।

শ্রদ্ধার মত সত্যকেও সযত্নে অনুশীলন করিতে হয়। ঐ অনুশীলনের আরম্ভ সত্যকথা হইতে। শিশুকালেই পড়িয়াছি—সদা সত্য কথা বলিবে। অতি সহজ উপদেশ—কিন্তু জীবনের জটিল পথে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই সরল উপদেশটি পালন করাও যেন দিন দিন কঠিন হইয়া পড়ে। নিজের দোষ ত্রুটি ঢাকিবার জন্য, সামান্য কিছু সুখ-সুবিধা লাভের জন্য,

নিজেকে জাহির করার জন্য—আমরা অনেক সময় মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হইনা। ভাবি, ইহাতে আর এমন কি ক্ষতি। কিন্তু জানি না, এই ছোটখাটো মিথ্যাগুলিও অলক্ষ্যে আমাদের কত অনিষ্ট সাধন করে—আমাদের চরিত্রকে কত দুর্বল করিয়া ফেলে। দোষ যদি করিয়া থাকি, নির্ভীকভাবে শাসনের সম্মুখীন হইব—নাই বা মিলিল মিথ্যার আশ্রয়ে সামান্য সুখ-সুবিধা। মুখে সত্যকে যাহারা বরণ করিবে তাহাদের চাই এইরূপ দৃঢ় মনোভাব।

সত্য-বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধিতে হয় সত্য-আচরণ। যাহারা জালিয়াতি করে, জুয়াচুরি করে—তাহাদিগকে সকলেই আমরা একবাক্যে নিন্দা করি। কিন্তু আমাদেরই দৈনন্দিন জীবনে সূক্ষ্মভাবে আমাদের নানা আচরণের মধ্যে কত প্রবঞ্চনা, কত মিথ্যা বাসা বাঁধিতেছে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে কি? যাহা আমি নই, নানাভাবে তাহা ভান করিয়া আমি সন্তোষ লাভ করি। আমার ভালবাসার মধ্যে, কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে, সমাজসেবার মধ্যেও এইরূপ কত ফাঁকি ঢুকিয়া আছে, তাহা আমার নজরে আসে না। ছোট বড় সব আচরণে সত্যনিষ্ঠ থাকা বাস্তবিকই অতি কঠিন কথা। তবুও উহা অভ্যাস করিতে হইবে। আপাতমনোরম বহু বিষয়কে এজন্য হয়তো নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে—অনেক মানসিক দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে হইবে, তবুও পরিশেষে তাহাতেই লাভ বেশী। সত্যই শ্রেয়ের পথ, সত্যই পরম সম্পদ।

সত্য-চিন্তা ইহারও এক ধাপ পরে। পাগল মন যে প্রতি মিনিটে একশ'টি চিন্তা করিতেছে তাহার অধিকাংশই মিথ্যাকে ভর করিয়া। জানে, উহা পাওয়া যাইবে না—তবু উহারই কথা তাহার ভাবা চাই। বার বার প্রমাণ পাইয়াছে, অমুক তাহাকে ভালবাসে না—তবুও তাহারই দিকে মন ছুটিয়া ছুটিয়া চলে। দেখিয়াছে, ও পথে গেলে ঘোর অনিষ্ট, দুঃখ—তবুও সেই পথেরই চিন্তা রার বার চিত্তে জটলা করে। বালির উপর দালান দাঁড়ায় না—তবুও মন উহাতেই ভিত করিয়া সৌধ নির্মাণ করিতে চায়। আকাশে গাছপালা কোথা হইতে আসিবে? তবুও মন আকাশেই কুসুমকানন রচনা করে।

রঙিন আশা, মিথ্যা কল্পনা লইয়া পড়িয়া থাকিলে মনের অজস্র শক্তি ক্ষয় হয়। সত্য যত কঠিন, যত আয়াস-সাধ্যই হউক, উহাকে নির্ভয়ে বরণ করা আমাদের কর্তব্য।

বাক্যে, কর্মে, মনে সত্যকে অবলম্বন করিতে করিতে জীবনে সঞ্চারিত হয় অমোঘ বীর্য। সে-জীবন অসাধ্য সাধন করিতে পারে, দেবতারা পর্যন্ত তাহাকে ভয় করিয়া চলেন।

পবিত্রতা ও সরলতা

পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, হৃদয়মনের উন্নতির জন্য তেমনই অপরিহার্য—পবিত্রতা। উহার সাধারণ অর্থ—অসৎ-চিন্তা, অসৎ-ভাব, অসৎ-সমালোচনা প্রভৃতি

বর্জন। ঐগুলি যদি মনে বাসা বাঁধে, কীটদষ্ট ফুলের মত দিন দিন মন বিরস, দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উহার সকল সৌন্দর্য নষ্ট হয়। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণ বড় বিষম কাল। এই সময়ে শরীরমনে জাগে প্রাণের এক নবীন চেতনা। সে যেন চায় দিকে দিকে ছুটিয়া চলিতে—রূপে, রসে, গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে নিজেকে বহুভাবে ছড়াইয়া দিতে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ে দেখা দেয় নূতন তেজ, এক অজানা উল্লাস। সমস্ত রক্ত নাচিয়া উঠে। প্রাণশক্তির এই নব জাগরণকে যদি ঠিক পথে চালিত করা না যায় তো সমূহ বিপদ। বহু বালকবালিকা ভুল করিয়া এই বিপদকে ডাকিয়া আনে, পবিত্রতা-হারা হইয়া কত দুঃখই না ভোগ করে।

প্রাণশক্তিকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে হইবে। নিন্দিত উপায়ে বিকৃত মলিন আনন্দের খোঁজে ওই শক্তিকে ক্ষয় না করিয়া উহা কাজে লাগাইতে হইবে চরিত্রের বল অর্জন করিয়া, উচ্চ আদর্শের অনুশীলন করিয়া, নির্মল জ্ঞানের, প্রেমের সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করিয়া। ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য। পবিত্রতাই উহার মূল কথা।

এই ব্রহ্মচর্যের—পবিত্রতার গুণ আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে বহুভাবে কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে। পাঠ্যজীবনে—যখন মানুষকে ভবিষ্যতের চলার পথে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে—উদ্বেল প্রাণের উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া ব্রহ্মচর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা

একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীনকালে এই দেশে ছাত্রজীবন নাগরিক জীবনের নানা কোলাহল, উত্তেজনা, প্রলোভন হইতে দূরে শান্ত তপোবনে ধার্মিক, জ্ঞাননিষ্ঠ আচার্যের নিকট থাকিয়া কাটাইবার ব্যবস্থা ছিল। বিলাস-ব্যসন বর্জিত অনাড়ম্বর একাগ্র জীবন ছিল বিদ্যার্থি-বিদ্যার্থিনীদের—পবিত্রতা ছিল তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম। জ্ঞানউপার্জনে, চরিত্রগঠনে, বিক্ষেপ বাধা ছিল কম। গড়িয়া উঠিত তখন মানুষের মত মানুষ—যাহারা পরে সমাজের নানা ক্ষেত্রে গিয়া সমাজকে ঠিক ঠিক উন্নতির পথে চালিত করিতে পারিত।

এই যুগে তপোবন আর গড়িয়া তোলা বোধ করি সহজ নয়—কিন্তু এখনও তপোবনের শিক্ষাধারার প্রধান সূত্রগুলি অনায়াসেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সত্য, শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, বিলাসরাহিত্য—এই সবই ছিল ঐ শিক্ষাপদ্ধতির বুনিয়াদ। এখনকার ছাত্রছাত্রীরাও ঐ বনিয়দাকে অনায়াসেই অবলম্বন করিতে পারে। তাহাতে লাভ ছাড়া লোকসান এতটুকুও নাই। অন্য দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাই করুক ভারতের বিদ্যাব্রতীদের জীবন যেন উজ্জ্বল থাকে শুচিতার শুভ্র আলোকে। শুধু বড় পণ্ডিত হওয়া, বৈজ্ঞানিক হওয়া, রাজনীতিজ্ঞ হওয়া, ব্যবসায়ী হওয়াই আমাদের যেন লক্ষ্য না হয়। ভারতীয় সভ্যতার ছাঁচে আমাদিগকে আদর্শ মানুষ হইতে হইবে। আমরা যেন হই আত্মত্যাগের, সত্যের, প্রেমের, বিশ্ব-মৈত্রীর বার্ত্তাবহ। উচ্ছৃঙ্খল

অপবিত্র জীবন আমাদের নয়। ব্রহ্মচর্যের আদর্শ কায়মনোবাক্যে আমাদিগকে পালন করিতে হইবে।

সৎচিন্তা, সৎভাব, সৎআদর্শ দিয়া মনকে পূর্ণ করিয়া রাখ। তাহা হইলে মন আর বিপথে ছুটাছুটি করিবে না। উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তিকে রূপান্তরিত কর কল্যাণকর কাজে, মহৎ উদ্দীপনায়, নির্মল ভালবাসায়, বিশুদ্ধ আনন্দে।

সরলতার স্থান পবিত্রতার পাশেই। কথায় বলে—'সরল পবিত্র শিশু।' ভগবান আমাদিগকে প্রথম পৃথিবীতে পাঠান—এই দুই আদিম স্বচ্ছ বর্ণে চিত্রিত করিয়া—সরলতা ও পবিত্রতা। আমাদের হাসিতে তখন ফুটিয়া উঠে সেই পরম শিল্পীর কলা-নৈপুণ্য। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়—আনন্দে আমাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরে। তারপর যত বড় হইয়া উঠি, সংসারের তপ্ত হাওয়ায় সেই স্বচ্ছ রং মলিন হইতে থাকে—ভগবানের স্পর্শ হইতে ততই আমরা দূরে সরিয়া যাই। এই দুঃখকর অবস্থা হইতে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। সেই নয়নাভিরাম ঈশ্বরীয় দীপ্তি যেন আমরা কখনও না হারাই। ছল, চাতুরী, কুটিলতা—এগুলিকে সাবধানে পরিহার করিতে হইবে, আমাদের অন্তরোদ্যানে এই আগাছাগুলির কোন স্থান নাই। শিশুর সরল পবিত্র হাসিটি সারাজীবন যেন হাসিয়া যাইতে পারি।

জ্ঞানস্পৃহা

যখন মাত্র আধো আধো কথা ফুটিয়াছে তখন হইতেই শিশু জানিতে চায় এটা কি, ওটা কি ? ইহাই জ্ঞানস্পৃহার মূল। ইহাই পরে বাড়িয়া মানুষকে বিবিধ জ্ঞানান্বেষণে নিযুক্ত করে। বিশ্বের কত রহস্যই না সে আবিষ্কারে লাগিয়া যায়। সৃষ্টি করে সে কত বিজ্ঞান, কত সাহিত্য, কত দর্শন।

জ্ঞানস্পৃহা মানুষের একটি অমূল্য সম্পদ। হেলায় ইহাকে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পারিবারিক ও সমাজিক অবস্থার চাপে বহু ব্যক্তি ইহাকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায় না। কঠোর দারিদ্র্যের দাহে কত সুন্দর মনীষা অকালে শুকাইয়া যায়। আবার সকল প্রকার সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও অনেকে তাহাদের মেধা ও বুদ্ধির যথাযথ সদ্ব্যবহার করে না। পাশ্চাত্যের কাছে এ বিষয়ে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। জ্ঞানলাভের জন্য তাহাদের আগ্রহ, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পরীক্ষা পাশ করাকে তাহারা খুব বড় করিয়া দেখে না। জানিবার, শিখিবার বিপুল উৎসাহে তাহারা অনেক প্রতিকূল অবস্থা, দুঃখকষ্ট সাদরে বরণ করিয়া লয়।

দেশ এখন স্বাধীন। জ্ঞানচর্চার বাহিরের অন্তরায়গুলি এখন একে একে দূরীভূত হইতেছে। এখন চাই শুধু ছেলেমেয়েদের ভিতরকার জাগরণ। চাই অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসা—জ্ঞানের জন্যই

জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, নৃবিদ্যা, মনোবিদ্যা, দর্শন—প্রভৃতি সর্ববিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত আমাদের ছেলেমেয়েদের ভিতর হইতে বাহির হইবে—যাহাদের মৌলিক চিন্তা, গবেষণা, জ্ঞানের গভীরতা অন্যান্য দেশের মনীষীদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট তো হইবেই না—বরং অনেক ক্ষেত্রে নূতন আলোকের সন্ধান দিবে। একদা ভারতের নালন্দায়, তক্ষশীলায় বিদেশ হইতে কত জ্ঞানপিপাসু নানা বিদ্যা, নানা শাস্ত্র শিখিতে সমবেত হইত। অতীতের সেই দিন আবার ফিরিয়া আসুক। কবির স্বপ্ন সফল হউক—

ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে

বিনয়

বিনয় দুর্বলতার লক্ষণ নয়—চরিত্রের মহৎ বল, মনোরম অলঙ্কার। ঔদ্ধত্য, অশিষ্ট আচরণকে শক্তির বিকাশ বলিয়া ভাবিও না। শক্তিমান হও, কিন্তু সেই শক্তির দম্ভ করিও না। উহাকে বশে রাখিতে অভ্যাস কর—দেখিবে ঐ শক্তি আরও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্—কি সুন্দর নীতিকথা! ঠিক ঠিক বিদ্যা অর্জন করিয়াছ কিনা, চিনিবার উপায় হইল তোমার

স্বভাবটি নম্র হইয়াছে কি-না। উপনিষদের একটি গল্প মনে পড়ে। শ্বেতকেতু বারো বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বাড়ীতে ফিরিল। কিন্তু সে সঙ্গে লইয়া আসিল উদ্ধত আচরণ, বিদ্যার অহঙ্কার। দেখিয়া পিতার মনঃকষ্টের সীমা রহিল না। তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য পিতা একদিন সূক্ষ্ম একটি প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু উত্তর দিতে পারিল না—দোষ চাপাইল গুরুর উপর—গুরু নিশ্চতই জানিতেন না—তাই শিখান নাই। পিতা বুঝাইয়া দিলেন দোষ গুরুর নয়, দোষ তাহার নিজেরই—নিজের দাম্ভিকতাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—সূক্ষ্ম তত্ত্বকে ধারণা করিবার ক্ষমতা বিকশিত হইতে দেয় নাই। তখন শ্বেতকেতুর আসিল বিনয়—পিতা তাহাকে তত্ত্বের উপদেশ দিলেন—মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে বিদ্যাকে সফল করিল। বিনয়-বিহীন বিদ্যা পঙ্গু, সৌন্দর্যহীন।

নিউটন ছিলেন বিজ্ঞান জগতের এক যুগপ্রবর্তক মহামনীষী। তিনি কি বলিয়াছেন? 'আমি সমুদ্র সৈকতে কেবল পাথর কুড়াইয়া বেড়াইলাম—অগাধ জ্ঞানসমুদ্রে নামিয়া রত্নরাজি আহরণ বহু দূর রহিয়া গেল।' এই বিনয়ের তুলনা নাই।

সক্রেটিস বলিয়াছিলেন—'আমি এই জানি, যে আমি কিছুই জানি না।' অথচ দৈববাণী হইয়াছিল সক্রেটিসই গ্রীস দেশের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী পুরুষ।

প্রাচীনকালে তপোবন শিক্ষাকেন্দ্রে ঋষিরা বিদ্যার্থিদের চরিত্রে

এই অতি প্রয়োজনীয় গুণটি ফুটাইয়া তুলিতে একান্ত যত্নবান ছিলেন। শিখাইতেন—

মধু বক্ষ্যামি, মধু বদিষ্যামি

কাহাকেও যেন রূঢ় কথা না বলি, সুমিষ্ট বাক্যে সকলকে যেন তৃপ্ত করিতে পারি।

জিহ্বা মে মধুমত্তমা

জিহ্বা হইতে আমার যেন বাহির হয় অমৃত-মধুর সুবিনীত ভাষা।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন

প্রণিপাতের দ্বারা জ্ঞানকে আয়ত্ত কর—গীতার এই বাক্যেই জ্ঞানার্জ্জনের গূঢ় সঙ্কেত চরমভাবে নির্ণীত হইয়াছে। সঙ্কেত—নম্রতা, শিষ্টতা, বিনয়।

সংযম

কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

বহুত ভলা না বরখা বাদর বহুত ভলা না ধূপ,
বহুত ভলা না বোলনা চালনা বহুত ভলা না চুপ।

বেশী মেঘবৃষ্টি ভাল নয়, অতি রৌদ্রও ভাল নয়। বেশী কথা বলা ভাল নয়, আবার একেবারে চুপ করিয়া থাকাও ভাল নয়। সংযমের আদর্শটি এই চার লাইনে স্পষ্টই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সংযম অর্থ—বাঁধন। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি

মঙ্গলজনক নয়—প্রকৃতির ক্ষেত্রেও যেমন, মানুষের বেলাতেও তেমন। বাঁধন দরকার—শৃঙ্খলা দরকার—যাহাতে শক্তি অনাবশ্যক খরচ না হয়, এলোমেলো নষ্ট না হয়। ইহাই সংযম।

ভগবান মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তুদের অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি দিয়াছেন। মানুষ সেই বুদ্ধির জোরে নিজের মধ্যে অনুভব করে এক অবাধ স্বাধীনতা। যেখানে বেড়া—যেখানে সীমা, অবরোধ—সেখানে সে করিতে চায় বিদ্রোহ। এই মুক্ত গতির ঝোঁক অবশ্যই মানুষের পরম কল্যাণকর—তাহার সকল উন্নতির মূল—কিন্তু তবুও উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন আছে। নহিলে উহা বিপথে গিয়া অনর্থ ঘটাইবে—যেমন নদীর পাড় ভাঙ্গিলে সে ঘটায় প্রাণান্তক বন্যা।

আহারে, খেলাধুলায়, উৎসাহ-উল্লাসে, আমোদ-প্রমোদে, কথাবার্তা, চালচলন, পারিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে—কোন কিছুতেই মাত্রা ছাড়াইয়া যাইও না। মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে যাহা উপকারী, তাহা করিবে অনিষ্ট—যাহা সুন্দর, তাহা দেখাইবে কুৎসিত—যাহা অমৃত, তাহা হইবে বিষ।

খাওয়া ঘুম প্রভৃতি শরীরমনের স্বাস্থ্যের জন্য দরকার। কিন্তু যদি বেশী খাও অথবা লোভে পড়িয়া নির্বিচারে যাহা তাহা খাও, তবে শরীর হইবে ব্যাধিমন্দির—অকালে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অস্বাভাবিক আলস্যের বশীভূত হইয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত যদি

ঘুমাইবার অভ্যাস কর তো বুদ্ধি হইতে থাকিবে জড়—কাজ করিবার মূল্যবান সময়ও হইবে নষ্ট।

অতিরিক্ত খেলাধুলায় মাতিয়া শরীর মনকে বড় বেশী ক্লান্ত করিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা, বিদ্যার্জনের তো বটেই। হাসি যখন মাত্রা ছাড়াইয়া অট্টহাস্যে পরিণত হয় তখন উহা হয় পীড়াদায়ক।

যাহারা বেশী কথা বলে তাহারা হইয়া যায় 'বকাটে'। কাহাকে কি বলা উচিত সে খেয়াল তাহাদের থাকে না, সত্য মিথ্যার দিকে হুঁশও তাহারা হারায়। তাহাদের কথার মূল্য এক পয়সাও নয়।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এক সময়ে বসিয়া খানিকক্ষণ গল্পগুজব, হাস্যপরিহাস করা ভাল—চিত্তের গ্লানি কাটিয়া যায়, শরীর মনের ক্লান্তি দূর হয়। কিন্তু ঐ গল্পগুজব যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তো উহা পরিণত হয় বাজে আড্ডায়। উহার একটা মাদকতা আছে—এমন এক অভ্যাসে উহা দাঁড়াইয়া যায় যে উহা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। মন হইয়া যায় লঘু, স্বভাব হইয়া পড়ে তরল। অতএব পরস্পরের সহিত মেলামেশাতেও সংযমের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সংযমের বন্ধন গোলামের বন্ধন নয়। ইহা মনুষ্যত্বকে খর্ব করে না—বর্ধিত করে। শক্তির অপব্যবহার কমাইয়া উহাকে করে প্রখর, বেগবান। সংযম হৃদয়মনে আনে স্থিরতা—চরিত্রে আনে সামঞ্জস্য, সৌষ্ঠব। সংযমকে উপেক্ষা করিও না।

সহানুভূতি ও সেবা

অপরের ব্যথায় ব্যথা অনুভব করার নাম সহানুভূতি। ইতর প্রাণীর মধ্যেও ইহা অনেক সময়ে পরিলক্ষিত হয়। একটি কাক আহত বা মৃত হইয়া মাটিতে পড়িলে শত শত কাক তাহার আশে পাশে উড়িয়া কা—কা শব্দ করিতে থাকে। গরু মহিষের দলে একটিকে আঘাত করিতে যাও—দেখিবে অপর পশুগুলি গুঁতাইতে আসিবে। একজনের বিপদ সকলে নিজেদের বিপদ বলিয়া মানে—একজনকে রক্ষা করিতে সকলে যুদ্ধ দিতে আসে।

নিজেকে ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিও না। অপরের দুঃখ বেদনা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইও না। উহাতে তুমি বাঁচিবে না—মরিবে।

এই বিশ্ব সংসার পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের উপর, প্রীতির উপর দাঁড়াইয়া আছে। পৃথিবী গাছকে রস দেয়, তৃণলতা বনস্পতি বাড়িয়া পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা করে, মানুষ পালে জীবজন্তু—জীবজন্তু কত রকমে করে মানুষকে সাহায্য!

সহানুভূতি বিশ্বপ্রকৃতির আদিম মঙ্গল বিধান। উহাকে মানিয়া লও—হৃদয়ে ডাকিয়া লও। হৃদয়কে একটু একটু করিয়া বাড়াইয়া যাও। প্রথমে পিতামাতা, ভাইভগিনী, আত্মীয়-স্বজন—ইঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিখ—ইঁহাদের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখ—পরে বন্ধুবান্ধব সহপাঠিদের জন্য, পাড়া-পড়শীর জন্য, গ্রামের লোকের জন্য, দেশের লোকের জন্য—

সকলের জন্য। সহানুভূতি বাড়িয়া বাড়িয়া সকল সীমা ছাড়াইয়া যাক। ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্বপ্রাণে পরিণত হউক। হৃদয়কে এইরূপ বাড়াইয়া যাওয়াতে কত আনন্দ, কত শান্তি! বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। মৃত্যুকে জয় করিয়া অনন্ত বিস্তারে অক্ষয় অমরত্ব লাভ কর।

গীতা বলেন—আদর্শ পুরুষ সেই যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে দেখিতে পারে—সকলের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া বোধ করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—**তাকেই বলি মহাত্মা যার হৃদয় দরিদ্রের জন্য কাঁদে।**

আমাদের সমাজের বহুবিধ দুরবস্থার মূলে দেখিতে পাওয়া যায় ব্যক্তি ও শ্রেণীগত স্বার্থপরতা—সহানুভূতির অভাব। এক শ্রেণীর লোক কতকগুলি সুযোগ সুবিধা কায়েমিভাবে ভোগ করিবার জন্য অপর কতকগুলি শ্রেণীকে নানা কৌশলে শত শত বৎসর দাবাইয়া রাখিয়াছে। ভুয়া শাস্ত্রের বুলি আওড়াইয়া, পরলোকের ভয় দেখাইয়া, ছলচাতুরী হুমকির সহায়ে তাহাদিগকে শিক্ষা, বিত্ত, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদেরই শ্রমে, তাহাদেরই বুকের রক্তে নিজেরা লেখাপড়া শিখিয়াছে, টাকা জমাইয়াছে, সুখ ঐশ্বর্য মান প্রতিপত্তির মালিক হইয়াছে। চালু হইয়াছে অস্পৃশ্যতা, জমিদারী, মালিকানা, নানাপ্রকার বিভেদ, বৈষম্য। শত শত বৎসরের

পরাধীনতা আমাদিগকে এত পীড়া দিতে পারিত না যদি আমরা নিজেরা হুঁশিয়ার হইতাম—সহানুভূতিকে জাগ্রত করিতাম—দেশের দিকে চাহিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে এমন করিয়া না বাড়াইয়া ফেলিতাম।

এখন নূতন করিয়া ভাবিতে শিখ, দেখিতে শিখ। আপনার পুরাতন স্বার্থ-কেন্দ্রিক জীবন ভাঙ্গিয়া—উদার সহানুভূতির বুনিয়াদে নূতন জীবন গড়িয়া তোল। চলো, আগে চলো।

সহানুভূতি রূপ নেয় সেবাতে। ভাল যদি বাসো তো হৃদয়ের কোণেই সে ভালবাসা লুকাইয়া থাকিবে না—তাহা ছুটিয়া বাহির হইবে ভালবাসার পাত্রের জন্য কিছু করিতে। ইহাই সেবা। শুধু মুখের সহানুভূতির মূল্য অতি সামান্য। কাজে দেখাইতে হইবে কতটা তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে, কত বড় তুমি দরদী।

চারিপাশে দুঃখ বেদনা অভাব অসহায়তা। সেবা করিবার অজস্র সুযোগ সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সহানুভূতিকে সক্রিয় করিতে লাগিয়া যাও। পাশের বাড়ীতে রোগী, মুখে জল দিবার লোক নাই। তুমি কি পার না স্কুল কামাই করিয়াও ওষুধ আনিয়া দিতে, বাড়ী হইতে কিছু পথ্য তৈরী করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে—দু চার জন বন্ধুকে ডাকিয়া পালা করিয়া সেবা করিতে ? তোমাদেরই পাড়ার এক পাশে ভগ্ন মলিন ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি—কুলী মজুরদের বাড়ী। ছেঁড়া

কাপড়পরা ছেলেমেয়েগুলি রাস্তায় রাস্তায় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের কাছে গিয়া রোজ আধঘণ্টা কাটাইয়া আসিতে পার কি? দুটি মিষ্ট কথা বলিলে, উহাদের সুখদুঃখের গল্প শুনিলে —কয়েকখানি বই সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে একটু পড়াইলে— উহারা কত সুখী হইবে, উহাদের কত উপকার করা হইবে! আর তোমার সহানুভূতি যে মুখের সহানুভূতি নয় তাহা প্রমাণিত হইবে। তোমারই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছে অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত, সর্বহারা। ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ সেই দিনের জন্য তাহাকে দুটি খাওয়াইতে পার না কি? গৃহদাহ, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ— এই সকল বিপর্যয়ে যত সামান্যই হউক তোমার অর্থের বা তোমার শরীরের সামর্থ্য দিয়া তুমি সাহায্য করিতে পার। বন্ধুদের সহিত একযোগে চাঁদা তুলিয়া দুর্গতদের সেবাকার্যে কিছু পাঠাইতে পার। প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমজীবীদের শিক্ষা, গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি বৃহত্তর স্থায়ী সেবাকার্যেও তোমার বিদ্যা দিয়া বা শারীরিক পরিশ্রম দিয়া অনেক সহায়তা তুমি করিতে পার।

সেবা—সেবক ও সেবিত উভয়েরই হিত সাধন করে। যে সেবা করে তাহার হৃদয় হয় নির্মল, মনে পায় সে পরম তৃপ্তি। সে বিশুদ্ধ আনন্দের তুলনা নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এ যুগে সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়াছেন।

সেবকের হওয়া চাই নিস্পৃহ—নীরব কর্মী। অপরে তোমার সেবা দ্বারা কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে এই ভাব মনে স্থান দিও না।

বরং ভাবিবে, সেবা করিয়া তুমিই ধন্য হইয়া যাইতেছ—তোমার নিজেরই জীবন উন্নত করিবার সুযোগ পাইতেছ। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'দাতা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুক, গ্রহীতা দাঁড়াইয়া দান করিতে অনুমতি দিক।'

ত্যাগ এবং সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ। যুগে যুগে এই দেশে বড় বড় রাজা, পণ্ডিত, শিল্পী, কবি, দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহাদের চিন্তা, কথা ও কাজের পশ্চাতে অপরের কল্যাণ সাধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। লোকের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা বা সাংসারিক লাভের দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। এদেশে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ আছে—যাহাদের রচয়িতা কে তাহা কেহ জানে না! শতাব্দীর পর শতাব্দী সহস্র সহস্র নরনারী সেই সব গ্রন্থ পড়িয়া গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা উহা লিখিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের নামটি পর্যন্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সেবার কি মহিমোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

নিজের পায়ে দাঁড়াও

গাছ তৈয়ারী করিতে হইলে আমরা জমিতে সার দিয়া বীজ পুঁতি। বীজ আপনিই ফাটিয়া অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুর হইতে আপনিই পাতা বাহির হয়—চারা আপনিই মাটি, জল, বায়ু শুষিয়া বাড়িতে থাকে। আমরা শুধু গাছের গোঁড়ার জমিটিকে সারবান ও পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করি, গাছ আপন শক্তিতেই বড় হইয়া চলে।

মানুষের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে—তাহাকে চলিবার জন্য, বড় হইবার জন্য নিজের পায়েই দাঁড়াইতে হয়। আদর্শ শুধু দেয় অনুপ্রেরণা, কোন্ দিকে চলিতে হইবে তাহার সন্ধান। চলিতে হইবে কিন্তু নিজেকেই—পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল জমির মত বাড়িবার পক্ষে উপযুক্ত কতকগুলি সরঞ্জাম যোগাইয়া দিবে মাত্র। বাড়িতে হইবে গাছের মত নিজেরই উদ্যমে, চেষ্টা যত্নে সাহসে।

দুর্বলতা, ভীরুতা, পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের চলার পথের বিষম শত্রু। যত শীঘ্র আমরা ঐগুলি কাটাইতে পারি ততই মঙ্গল। কেহ তোমাকে হাতে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিবে না, টানিয়া হিঁচড়াইয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াও—নিজে নিজে চলো।

স্বাবলম্বন আত্ম-শ্রদ্ধারই একটি অভিব্যক্তি। আমার নিজের করিবার শক্তি আছে, যথাসাধ্য করিয়া দেখি—একান্ত না পারি তখন অপরের সাহায্য চাহিব—এইরূপ মনোভাব আত্ম-মর্য্যাদার পরিচায়ক, চরিত্রবলের সহায়ক। পাশ্চাত্য দেশের ধনীরাও নিজেদের মোট নিজেরা বহিতে, বাগানের কাজ নিজেরা করিতে, ঝুল ঝাড়িয়া, জঙ্গল সাফ করিয়া, বাড়ী পরিষ্কার রাখিতে আনন্দ বোধ করেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবনধারা হইতে এই মহৎ গুণটি আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। দৈনন্দিন ঘরসংসারের কোনও বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী না হইতে হয় সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবে। **'বলং বলং আত্মবলম্'**—এই প্রচলিত কথাটি যেন আমরা সর্বদা স্মরণ রাখি—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

আমরা অনেক সময় নিজেদের আলস্য ও দুর্বলতা ঢাকিতে চাই ভগবানের ও কর্মফলের দোহাই দিয়া। কোন কাজ সিদ্ধ করিতে গেলে যতটা পরিশ্রম ও সাহস দরকার তাহা স্বীকার করিতে চাই না—খানিক দূর গিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বলি, 'ভগবানের ইচ্ছা নয় তাই হইল না।" নিজের কোন অভাব বা কস্ট পৌরুষ সহায়ে দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া সহ্য করিয়া চলি—বলি, 'কি করিব, আমার কর্মফল।' এই প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান তাহাকেই সাহায্য করেন যে তাঁহার দেওয়া শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে! কর্মফল হইতে ভয় পাইবার আমাদের কিছুই নাই। আমরা নিজেরাই

তো আমাদের কর্মফলের স্রষ্টা। যদি কোন অতীত কর্মের ফলে আমার চলিবার পথে বর্তমানে বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে তবে এখনই আমি অন্য কর্মের দ্বারা সেই বাধাকে দূর করিয়া দিতে পারি। ইহাই বীরের কথা, মানুষের কথা।

খুব বেশী আগে নয়, এমন দিন ছিল যখন আমাদের দেশের উচ্চবর্ণেরা বলিতেন, মুচি, মেথর, চাঁড়াল, ডোম—ইহারা কর্মফলে নীচ অস্পৃশ্য জাতি হইয়া জন্মিয়াছে—আমরা তার কি করিতে পারি? উহারাও তাহাই বিশ্বাস করিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী উচ্চবর্ণদের এই হৃদয়হীন মিথ্যা দার্শনিকতার ফাঁকি ধরিয়া দিলেন। এখন মুচি মেথরেরা জাগিয়া উঠিতেছে, অন্যের মুখ না চাহিয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। উহাদের অগ্রগতি আর কে রোধ করিতে পারে?

ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও বাড়িবার উপায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো। এক জাতি অন্য জাতিকে বাহিরের খানিকটা সাহায্য করিতে পারে মাত্র। সেই সাহায্য লইয়া জাতিকে ভিতরের শক্তি জাগাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হয়। আমরা বহু বৎসর ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়োছিলাম। সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছিল। পরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন আমরা বুঝিতে পারিলাম উহা নিষ্ফল এবং নিজেদের শক্তিকে সংহত করিয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিলাম—তখনই শুভদিনের সূচনা হইল। ভারত স্বাধীন হইল ভারতীয়দেরই আত্মশক্তিতে।

স্বাধীন হইয়া ভারতের সব সমস্যা মিটে নাই। খাদ্যসমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, শিল্প-বাণিজ্য-দেশরক্ষা-কৃষি প্রভৃতি কত সমস্যারই না এখন আমাদিগকে সমাধান করিতে হইবে। বিদেশের দিকে না চাহিয়া আমরা নিজেদের বুদ্ধি, সাহস ও কর্মকুশলতার উপর যত নির্ভর করিব ততই এই সকল সমস্যার আশু মীমাংসা হইবে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী যখন সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিল তখন অনেকেই মনে করিয়াছিল প্রবল পরাক্রান্ত হিটলার-বাহিনী অল্পসময়ের মধ্যেই ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত রাশিয়াকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট নিজের উপর নির্ভর করিয়া জাতির শক্তিকে কি ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিল তাহা বাহিরের লোকের অল্পই জানা ছিল। আমেরিকা বা বৃটেনের নিকট নামমাত্র সাহায্য লইয়া সোভিয়েট সৈন্য বিশ্ববিক্ষোভকারী নাজি শক্তিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

মহৎ আদর্শকে পাওয়া দুর্বলের কাজ নয়। নিজেকে গড়িয়া তোল, নিজে গা তুলিয়া দাঁড়াও। সমস্ত আশ্মান তোমার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ুক—তবুও ভয় পাইও না। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' —কল্যাণের পথে অনেক বাধা। কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বজ্রের মত ইচ্ছাশক্তি, অদম্য সাহস দ্বারা সব বাধা, সব বিপত্তিকে দূর করা যায়।

উদার আকাশতলে

ঘরের কোণ হইতে উদার আকাশের নীচে আসিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইতে হইবে। চরিত্রে কূপমণ্ডুকতার মত গ্লানিকর আর কিছু নাই। দৃষ্টিকে বাড়াইয়া দিতে হইবে দূরে—বহুদূরে—বাড়ীর উঠান ছাড়াইয়া, স্কুলের প্রাঙ্গন, খেলার মাঠ, বন্ধুবান্ধবদের মিলনের স্থান ছাড়াইয়া, পুঁথিপত্র, কালিকলম, নিজের ধরা-বাঁধা রুটিনের গণ্ডি ছাড়াইয়া। শুধু পড়া মুখস্থ করিয়া শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকটি হইয়া থাকিলে চলিবে না। বিত্তালয়ের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরেও হানা দিতে হইবে—শুনিতে, দেখিতে, শিখিতে হইবে অনেক কিছু। চৌকস মানুষ হইতে হইবে।

দেশ-বিদেশের খবর

নিজেদের দেশে এবং তাহার বাহিরে দুনিয়ার কোথায় কি হইতেছে আজকালকার যুগে ছেলেমেয়েদের মোটামুটি তাহার খবর না রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র বাহির হইতেছে—ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়—রেডিও রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সভাসমিতি, আসরআখড়া—সর্বত্র বিশ্বের খবরাখবর পাওয়া এ যুগে অতি সুলভ।

সংবাদপত্র পড়ার পিছনেও একটা মহৎ লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু সময় কাটাইবার জন্য বা চিত্তবিনোদনের জন্য উহা পড়া নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নরনারীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত একটি নিবিড় যোগ আমরা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি। সারা বিশ্ব যে এক—সমস্ত মানুষ যে এক।

সঙ্গীত

গান গাহিতে না পারিলে পরীক্ষা পাশের কোন বাধা নাই বটে—কিন্তু গান জিনিষটি লেখাপড়ার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। সকলকে যে ওস্তাদ হইতে হইবে বা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে কিংবা অপরকে শুনাইয়া প্রশংসা লইতে হইবে এইরূপ কথা উঠিতেছে না—সকলে কিছু ঐরূপ ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণও করে না। কথা এই—চরিত্রকে উন্নত করিতে, শক্তিমান করিতে, জীবনে বিশুদ্ধ আনন্দ, সাম্য ও শান্তি আনিতে সঙ্গীত একটা মহৎ অবলম্বন—সঙ্গীতের প্রতি নিজের সময়, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যথাযথ মনোযোগ অবশ্যই আমাদের দেওয়া প্রয়োজন। গলা খুলিয়া গান গাহিতে না পার গুণ গুণ করিয়া গাহিবারও একটা সার্থকতা আছে। নিজে গাহিতে না পার ভাল শ্রোতা হইতে পারিলেও সঙ্গীত তোমার জীবনকে উন্নত করিতে প্রভূত সহায়তা করিবে। কণ্ঠসঙ্গীত কঠিন মনে হইলে যন্ত্রসঙ্গীতের চেষ্টা করিতে পার। যে কোন দিক দিয়া সঙ্গীতের উপর একটা প্রীতি জাগাইতে পারিলে চরিত্রের একটা সম্পদ উপার্জ্জন করিলে।

মানুষ, পৃথিবীর মানুষ—কিন্তু পৃথিবীর অতীত পরম সত্যের জন্য তাহার প্রাণে একটা গোপন পিপাসা সঞ্চিত থাকে। সুর সন্ধান দেয় সেই লোকাতীত সত্যের। সুরের রেশ ধরিয়া আমরা রূপ-রস-গন্ধের স্থূল সীমা ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। সেখানে নাই বিদ্বেষ, নাই কামনা, নাই দ্বন্দ। আছে শুধু অনাবিল প্রাণমাতানো আনন্দধারা।

ঐ সুর প্রতি মানুষকেই স্পন্দিত করিতে পারে। প্রতি মানুষই উহাকে সমাদর করিতে পারে, উহার সহিত যোগ স্থাপন করিতে পারে। শুধু চাই ইচ্ছা, শুধু চাই উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।

ভগবানের সম্বন্ধে অনেক বই পড়, চোখ বুঁজিয়া তাঁহার চিন্তা করিবার চেষ্টা কর—যে উদ্দীপনা আনন্দ না পাইবে, সুর জুড়িয়া একবার গাহিয়া দেখ—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিত পাবন সীতা রাম।

—দেখিবে কি ফল হয়। কোন্ অজানা স্তব্ধতা চিত্তকে করিবে আকর্ষণ, কোন অলক্ষিত দরজা দিয়া প্রাণে প্রবেশ করিবে অনির্ণেয় এক পবিত্র উল্লাস। ভাষা যাহা পারে না, চিন্তা যাহা পারে না, সুর তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে।

কৃষকের ছেলেমেয়েরা মাঠে গরু চরাইতে গিয়া, জঙ্গলে ঘাস কাটিতে গিয়া যখন পাখীর কলতানের সঙ্গে উদার আকাশের তলে

আপন প্রাণে গান গায়, বাঁশের বাঁশী বাজায়—দাঁড়াইয়া শুনিয়াছ কি? মাঝিরা নৌকার বৈঠা টানিতে টানিতে জলের ছপ্ ছপ্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদের হৃদয়ের সুখদুঃখ, আশাউল্লাস সারির গানে প্রকাশ করিয়া যায়—কান পাতিয়া উপভোগ করিয়াছ কি? একতারা বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে বাউল যখন ভিক্ষা করিতে আসে—উহার রসাস্বাদন করিয়াছ কি? সঙ্গীত-সাম্রাজ্ঞী বীণাবাদিনী সরস্বতী কি এই সব সরল পূজারীদের পূজা গ্রহণ করেন না? নিশ্চিতই করেন।

আড়ম্বর না হইলেও সঙ্গীত হয়। সেই সহজ সঙ্গীতই বরং বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, স্নানের সময় কলঘরে কল খুলিয়া জলের শব্দের সঙ্গে গলা ছাড়িয়া গাহিবার অভ্যাস করিতে। হার্মোনিয়ম যন্ত্রটি আমাদের দেশের সঙ্গীতের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। অনেক স্বাভাবিক মিষ্ট গলা হার্মোনিয়মের কৃত্রিমতার কবলে পড়িয়া নষ্ট হইতে দেখা যায়। অপরের নিকট শুনিয়া খালি গলায় গাহিবার অভ্যাস করা ভাল। তাহাতে মূল গানের তাল, টান এবং লালিত্য বজায় থাকার বেশী সম্ভাবনা। হার্মোনিয়ম অনেক সময় প্রথম শিক্ষার্থীর গলা অঘাটে টানিয়া লইয়া গিয়া গানের মূল সুরটিকে বিকৃত করিয়া দেয়।

হাতের কাজ

আমাদের দেশে এতদিন স্কুলকলেজে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যার উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত। বই—বই—

বই, ইহা ছাড়া শিক্ষার্থীদের যেন আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার কিছু নাই। ইদানীং এই ধারণার পরিবর্তন হইতেছে। হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাপ্রবর্তন—বুনিয়াদী-শিক্ষা পদ্ধতির এই আদর্শটি খুবই অভিনব এবং প্রশংসার যোগ্য। মানুষকে হইতে হইবে কর্মী, স্রষ্টা—সংগঠক।

সৃষ্টির প্রেরণা মানুষ সঙ্গে লইয়াই পৃথিবীতে আসে। শৈশবে ধূলাখেলার সময়েই তো আমরা ছিলাম কারিগর। কাদা দিয়া পুতুল গড়িতাম—কয়েক টুকরা নুড়ি, একটু সুরকির গুঁড়া, দুচার টুকরা ভাঙ্গা কাঁচ, কয়েকটি ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স কুড়াইয়া আনিয়া গৃহ নির্মাণ করিতাম—কাগজের নৌকা চৌবাচ্চার জলে ভাসাইতাম—বাঁখারির প্রান্তে টিনের চাকতি মারিয়া গাড়ী চালাইতাম। ছেলেবেলার স্বচ্ছ আনন্দের একটা বৃহৎ অংশ আসিত আমাদের এই সৃষ্টির ক্ষমতা হইতে।

বড় হইয়াও আমাদের সহজাত এই মহৎ ক্ষমতাকে আমরা যেন শীর্ণ করিয়া না ফেলি। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হাতের কাজের অভ্যাস রাখিলে আমাদের চরিত্রের একটা দিক পূর্ণ থাকিবে। ছেলেবেলায় সৃষ্টির প্রেরণা প্রকাশ পাইয়াছিল খেলার ভিতর দিয়া—এখন ফুটিয়া উঠিবে সত্যকারের কাজের জিনিষ গড়িয়া।

মহাত্মা গান্ধী—চরখা কাটার ব্যাপক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হওয়া সত্বেও ছেলে বুড়ো অবসর

সময়ে সকলেই কিছুটা চরখার সূতা উৎপাদন করে,—মহাত্মাজীর ছিল ইহা প্রাণের ইচ্ছা। শরীর, মন উভয়েরই উন্নতি সাধক আর একটি সুন্দর হাতের কাজ—বাগান-করা। বাড়ীর এক পাশে কয়েক হাত জমি লইয়া কয়েকটি শাকসব্জীর গাছ তৈরী করিয়া দেখ তো—কত আনন্দ তাহাতে। নিজের হাতে রোপা ফুলগাছের একটিমাত্র ফুটন্ত ফুল দেখিয়া, তুলিয়া যে তৃপ্তি পাইবে, বড় মানুষের বাগানের বিচিত্র পুষ্প-লতার সম্ভার দেখিয়া সে তৃপ্তি পাইবে না। সেলাই প্রধানতঃ মেয়েদেরই কাজ, তবুও অল্পবিস্তর দর্জিগিরি ছেলেরা অনায়াসেই শিখিতে পারে, বাড়িতে সেলাইএর কল থাকিলে ছোটখাটো কাজের জন্য মাকে দিদিকে কষ্ট দিতে হয় না। সহজ-সাধ্য ছুতোরের কাজ, কাপড় ইস্ত্রি করা, দেওয়াল চূনকাম করা, ইলেক্‌ট্রিক মেরামত প্রভৃতি শিখিয়া রাখিলে সময়ে অসময়ে বাড়ীর অনেক কাজে আসে। মোটামুটি রান্নার কাজ জানা প্রত্যেকেরই উচিত। ছুটির দিনে ভাই বোন বন্ধুরা এক সঙ্গে বসিয়া নিমকি, সিঙ্গাড়া ভাজিয়া গরম গরম খাওয়া এবং খাওয়ানো কত আনন্দের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

খাতা বই প্রভৃতি বাঁধানো শেখা খুব কঠিন নয়। নিজেদের বই প্রভৃতি ছিঁড়িয়া গেলে নিজেরাই যদি বাঁধিয়া লইতে পার তো কত খরচ বাঁচিয়া যায়।

ছবি-আঁকাকেও পুঁথিগত বিদ্যার বাহিরে উদার আকাশ তলের এক অন্যতম ব্যাপৃতি বলিতে হইবে। সকলের জন্য ইহা নয়। তবে অল্পবিস্তর ছবি-আঁকার অভ্যাস, চেষ্টা করিলে অনেকেই আয়ত্ত করিতে পারে। পূর্বোক্ত অন্যান্য হাতের কাজের সৃজনীশক্তির অনুশীলনের সঙ্গে যেমন একটা বিশেষ উপকারিতা আছে ছবি-আঁকাতে হয়তো সেরূপ কিছু নাই—কিন্তু তাই বলিয়া ইহার প্রতি আগ্রহ আমাদের কম থাকা উচিত নয়। ছবি বা আর্টের স্থান সঙ্গীতের পাশা-পাশি। সঙ্গীতেরই মত ইহা মানুষের হৃদয়মনকে লইয়া যায় সূক্ষ্ম আনন্দলোকে। চিত্রকর একজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। ছবি আঁকিতে পার আর নাই পার অন্ততঃ ভাল ছবির সমঝদার হইতে পারাও ভাল কথা।

কবিতা

পাঠ্যপুস্তকে যে কয়টি কবিতা পরীক্ষাপাশের জন্য চিহ্নিত, সেই কয়টি পড়িয়া এবং বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্থ করিয়াই কবিতার প্রতি সমাদর শেষ করিও না। কবিতা উদার আকাশ তলের জিনিষ—বিদ্যালয়ের সীমায় গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিবার বস্তু নয়। সারা জীবন ধরিয়া ইহাকে সম্মান করিয়া যাইতে হয়, ভালবাসিয়া যাইতে হয়। গভীর দুঃখ-বেদনার সময়, আনন্দ-উল্লাসের দিনে, অতীতের স্মৃতিতে,

বর্তমানের প্রবহমান ঘটনাধারায়, একান্তে—আবার অনেকের সহিত, কবিতা সমানভাবে আমাদের হৃদয়কে তুলিয়া ধরে, চিত্তকে প্রসন্ন করে। কবিতা সঙ্গীতের মত, চিত্রকলার মত অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান আনে। সঙ্গীতে যাহা সুর, চিত্রকলায় যাহা রঙের আলোছায়া, কবিতায় তাহা ছন্দ। ছন্দের নর্তনে কবিতা প্রাণকে নাচাইয়া তুলে।

চীৎকার করিলে যেমন গান হয় না, রঙ ছিটাইলেই যেমন ছবি হয় না, সেইরূপ অক্ষরে অক্ষরে মিল করিয়া দিলেই কবিতা রচিত হয় না। কবিতার প্রাণ হইল ভাব প্রকাশের ভঙ্গিমা। উহা সহজসাধ্য নয়।

কবিতা-পাঠ, কবিতা-উপলব্ধি কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। বাঙলার কবি, ভারতের কবি, বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথকে গভীর হইতে গভীরতর ভাবে চিনিতে থাকো। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের ঋষিরা, মনীষীরা মানুষের কল্যাণকর যে-সব চিন্তাধারা রাখিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। ভারত-সভ্যতার নিবিড় পরিচয় উহা বহন করিয়া আনে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মানে বিজ্ঞান আলোচনা নয়, মানুষের মনের যে শক্তিবলে বিজ্ঞান জন্ম নেয়, বাড়িয়া উঠে—সেই শক্তির

অনুশীলন। উহা জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। ঐ শক্তির মূল কথা—সত্য কি-না যাচাই করিয়া নেওয়া, যাহা সত্য তাহাকেই বরণ করা, ধরিয়া থাকা।

যাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নাই সে ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, গুজবে বিশ্বাস করে, পদে পদে প্রতারিত হয়, যাহা তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া ভুল পথে চলে। কোন কিছুর ভাল মন্দ বিচার করিবার আগে আদ্যোপান্ত উহার তথ্য অনুসন্ধান কর। খানিকটামাত্র দেখিয়া আর বাকীটা কল্পনা করিয়া লইয়া রায় দিও না। তাহা হইলে তোমার বিচার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই তথ্য অনুসন্ধানের নামই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। জিনিষ কিনিতে, কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে, কোন একটি নূতন অভ্যাস আরম্ভ করিতে, বিশেষ কোনও কাজে ব্রতী হইতে—এই পর্যবেক্ষণ শক্তি যত বেশী খাটাইতে পারিবে ততই তুমি লাভবান হইবে। ততই তোমার প্রত্যেকটি কাজ হইবে সুসম্বদ্ধ—উহার ফল সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা থাকিবে না—উহা সম্পন্ন করিতে তোমার সময় ও পরিশ্রম লাগিবে কম।

অমুকে বলিয়াছেন বলিয়াই নির্বিচারে যাহা তাহা মানিয়া লইবার আবশ্যক নাই। যদি সন্দেহ হয় যাচাই করিয়া লও। ইহাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। অন্ধ বিশ্বাসে, ভয়ে বা লজ্জায় পড়িয়া স্বীকার করিয়া লওয়া, কুড়েমির জন্য পূরা অনুসন্ধান না করিয়া

একটা কিছু ধরিয়া লওয়া—এইগুলি হইতেছে ঐ দৃষ্টির সম্পূর্ণ উল্টা।

যাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে সে বিজ্ঞান না জানিয়াও ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক। পুঁথির বিজ্ঞান না জানিলেও তাহার বেশী কিছু আসিয়া যায় না। সে বিজ্ঞানকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে। প্রখর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার বলে সে চোখ কান নাক প্রভৃতি দিয়া প্রকৃতির বহু রহস্য আবিষ্কার করে। সমস্ত জীবনটাই তাহার লেবরেটরী।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে আজকালকার মত বিজ্ঞানের প্রসার ছিল না বটে, কিন্তু চরিত্রে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে সজাগ রাখিবার খুবই চেষ্টা ছিল। সেকালের মনীষীরা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের সর্বপ্রসারী পরিদর্শন শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যন্ত্রপাতি, লেবরেটরী প্রভৃতি ব্যতীতও এমন অনেক বিদ্যা তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলিতে একটুও সঙ্কোচ হয় না।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। দৈনন্দিন জীবনের চারি পাশেই বিজ্ঞানের প্রভাব। বিজ্ঞানের সাদাসিধা কথাগুলি বিজ্ঞানের ছাত্র না হইলেও সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ জিনিষটা কি—রেলগাড়ী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ কিভাবে চলে—গ্রামোফোন, রেডিওরই বা বুনিয়াদ

কোন তত্ত্বের উপর ইত্যাদি শতসহস্র প্রাত্যহিক ঘটনাগুলির জ্ঞান ইচ্ছা থাকিলেই রাখা যায়। না-রাখা কূপমণ্ডুকতা, রাখিলে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, জগৎকে ভাল করিয়া চেনা যায়—জীবনে ভাল করিয়া চলা যায়।

নিভৃতে

মানুষকে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হয়। আহার, বিহার, শিক্ষা, জীবিকাউপার্জন—সব বিষয়েই তাহার প্রয়োজন হয় অপর মানুষের সঙ্গ। একা সে বাঁচিতে পারে না। তবুও মানুষের প্রাণে মাঝে মাঝে নির্জনতার জন্য একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অপর কেহ নাই—শুধু সে একা—এই রকম একটা অবস্থিতি যেন তাহার দরকার হইয়া পড়ে। মানুষের প্রাণের এই ইচ্ছার একটা মস্ত সার্থকতা আছে। সজনতা যেমন তাহার চলার পথের অপরিহার্য সম্বল, নির্জনতাও তেমনি তাহার কম উপকার সাধন করে না। দশজনের ভিতর, কোলাহলের ভিতর সর্বদা থাকিলে মন যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, অনবরত দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া সে হইয়া পড়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন। তখন নিভৃতে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিলে মন আবার আপনাকে ফিরিয়া পায়—আবার তাহাতে আসে সতেজ ভাব, উৎসাহ। নিস্তব্ধতার মধ্যে মনের যেন নবজীবন লাভ করার শক্তি লুকানো আছে।

নিভৃতে গেলে মন নিজেকে দেখিবার অবসর পায়। উদ্দাম কর্মস্রোতে সে তো ছুটিতেছে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, আলো-আঁধার যাচাই করা সব সময়ে তাহার হইয়া উঠে না। নির্জনে সে একটু থামিবার অবসর পায়—তখন সে হিসাব করিয়া দেখিতে পারে কতটা তাহার লাভ লোকসান হইল—কতটা সে ভাঙ্গিয়াছে, কতটা গড়িয়াছে, কত পা আগাইয়া গেল, কত পা-ই বা পিছাইয়া আসিয়াছে। এই হিসাব নিকাশ অর্থাৎ আত্মপরীক্ষা, উচ্চতর আদর্শ পথে অত্যন্ত প্রয়োজন।

মন যখন কেবলই নাচিতেছে সেই অবস্থায় জগৎ-সংসারের অনেক বৃহত্তর সত্য মনের কাছে আসিতে সাহস পায় না। জানে—মন মাতিয়া আছে, উহাদিগকে সমাদর করিবার তাহার সময় নাই। তাহারা আড়ালে বসিয়া লক্ষ্য করে মনের কাজ কখন কমিয়া আসিবে, কখন তাহার ফুরসত হইবে। যেই দেখে সুযোগ উপস্থিত, মন একমুখী হইয়াছে, অমনি তাহারা শুভ্র সুন্দর মূর্তিতে মনের সামনে হাজির হয়—মন দেখিয়া অবাক হয়—বলিয়া ওঠে, একি, একি। এমনি করিয়াই কত মহান সত্য কবিরা, দার্শনিকেরা, ধর্মসাধকগণ, শিল্পীরা—এমন কি বৈজ্ঞানিকগণও আবিষ্কার করিয়াছেন। সজনতার মধ্যে—কোলাহলের মধ্যে যাহাকে ধরা একেবারেই অসম্ভব ছিল, নিভৃতে তাহা বিদ্যুৎপ্রভার মত হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরস্থ শিলাইদহ গ্রামে অনেক সময় যাইতেন। পদ্মাবক্ষে এক বজরায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা তাঁহার সময় কাটিত। বিশ্বপ্রকৃতির গূঢ়তম সত্তার সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া দিয়া তিনি লাভ করিতেন সত্য, শিব, সুন্দরের নিবিড় স্পর্শ। সেই অনুভূতি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার কবিতায়, গানে। জার্মান দার্শনিক কাণ্টকে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনার মনে একা একা একটি পার্কে বেড়াইতে দেখা যাইত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সারাদিন লেবরেটরীর কাজ, লেখাপড়া, আরও নানাপ্রকারের কাজে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইতেন না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় গড়ের মাঠে গিয়া খানিকক্ষণ একা একা বেড়াইয়া আসা তাঁহার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। ইহা যে শুধু শরীর-রক্ষার জন্য মুক্ত বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যেই তাহা নয়—মনকে নির্জনতা রূপ পুষ্টিকর খোরাক দেওয়াও ছিল তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য। তিনি জীবনে গঠনমূলক যত বড় বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন উহার শক্তি বহুল পরিমাণে আসিয়াছিল নিভৃতচিন্তা হইতে। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা নানাশাস্ত্র, নানাবিদ্যা সম্বন্ধে যে সব মৌলিক গবেষণা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন উহাদেরও সামর্থ্য তাঁহারা লাভ করিতেন নির্জনতা হইতেই।

কিয়ৎক্ষণ নিভৃতে কাটাইয়া আসা দৈনন্দিন জীবনের রুটিনের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে মনের একাগ্রতা, গভীরতা,

সমতা বৃদ্ধি পাইবে। উহা আমাদের চরিত্রের বিপুল সম্পদ সন্দেহ নাই।

খুব ভোরে উঠিয়া একা একা উন্মুক্ত প্রান্তরে—শস্যক্ষেত্রের মাঝ দিয়া—নদীর কূল ধরিয়া ধরিয়া বেড়াইয়াছ কি? সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির সঙ্গে, কলতানরত পাখীদের সঙ্গে প্রভাত সূর্যকে আবাহন করিয়াছ কি? নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে জনমানবহীন প্রান্তরে—পুষ্করিণীর ঘাটে—দূর রাস্তার পাশে বটগাছটির ছায়ায় একা একা আধঘণ্টা কখন বসিয়া থাকিয়াছ কি? এই নিঃসঙ্গতা বিনা আড়ম্বরে অলক্ষ্যে তোমার হৃদয়কে দিয়া যাইবে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের যাদুস্পর্শ, আনিবে পবিত্রতা, আনিবে স্নিগ্ধ শান্তি।

আবার গভীর রাত্রে, সকলে যখন ঘুমাইয়া আছে, একা একা উঠিয়া ঘরের বাহিরে নক্ষত্রখচিত অসীম আকাশের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া দেখিও—উপলব্ধি করিবে কবি কেন গাহিয়াছিলেন—

বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।

বিশ্ব ঘুমায় বটে, কিন্তু বিশ্ব যে অন্তরতম সত্যে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সেই সত্যের তো নিদ্রা নাই। তিনি সর্বদাই জাগিয়া আছেন। কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। নিঃশব্দতার মধ্যে, একান্ততার মধ্যে তাঁহার শাশ্বত বীণার অনুপম ঝঙ্কার আমাদের কানে ভাসিয়া আসে।

উপনিষদের সেই বাণী আবার স্মরণ কর—**জ্যায়ান্ পৃথিব্যা—জ্যায়ান্ অন্তরীক্ষাৎ—জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্য।** মানুষের এই অন্তরতম সত্য—তাহার বৃহৎ পরিচয়—তাহার এই সর্বজয়ী মর্যাদাকে অনুভব করিতে নির্জনতা করে পরম সহায়তা। উহাকে তাই উপেক্ষা করিও না—বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর।

পরিবার ও সমাজ

পরিবার

উৎকর্ষ-প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়ের অনুভূতি—ভগবানের দেওয়া এই দুই বিশেষ সম্বল সহ মানুষ তাহার চলার পথে অন্যান্য প্রাণীকে পিছনে রাখিয়া প্রথম যে পৈঠায় পা দিয়াছিল তাহার নাম পরিবার। অনেকে এক সঙ্গে থাকিলেই পরিবার গড়ে না। পুরুষ-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি লইয়া অনেক পশু একসঙ্গে বাস করে বটে কিন্তু উহা পরিবার নয়—যূথ, বা দল। মাত্র জৈবিক প্রয়োজনেই উহার উৎপত্তি—ঐ প্রয়োজন মিটাইয়া উহার পরিসমাপ্তি। এই একত্র বাসের পশ্চাতে কোন স্বাধীনতা নাই, কোন হৃদয়ের আবেগ নাই। যূথ পশুদের আপন সৃষ্টি নয়—জীবসংরক্ষণের জন্য প্রকৃতিই উহা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাণিজীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলি পশুরা যেভাবে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়, একত্রবাসটিও সেইরূপ। জৈবিক প্রয়োজন ফুরাইলে উহাও ধ্বসিয়া পড়ে। পশুদের পারস্পরিক মিলন ও সৌখ্যের ভিত্তি তাই অতি শিথিল।

মানুষ কিন্তু যখন পরিবার গড়িয়া তুলিল তখন সে শুধু দেহের জীবনের দিকেই তাকায় নাই। সে যেন একটি সোনার স্বপ্ন দেখিয়া স্বাধীন ইচ্ছায় বুদ্ধি খাটাইয়া, হৃদয়ের আবেগকে প্রকট করিয়া উহা সৃষ্টি করিয়াছিল। জীব-সংরক্ষণ উহার মূল

লক্ষ্য নয়—উহার লক্ষ্য পশুমানুষকে দাবাইয়া উন্নত মানুষকে প্রতিষ্ঠা করা—ভালবাসা, সেবা ও সাহযোগিতার প্রকাশে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করা, সমুজ্জ্বল করা। পারিবারের প্রতিষ্ঠা, উচ্চতর সত্যে—তাই উহার ভিত্তি অকম্প, সুদৃঢ়।

ইতর প্রাণীর মা-বাবা-ভাই-বোন-স্ত্রী বলিতে কতটুকু বুঝায়? যেটুকু নিছক জৈবিক আবেগ তাহারা পরস্পর অনুভব করে তাহার মূল্য কতটুকু, স্থায়িত্ব কতটা? কিন্তু মানুষের? মানুষ এই সম্বন্ধগুলিকে লইয়া গড়িয়া তোলে নীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম অফুরন্ত উদ্দীপনা। পায় গভীর শিক্ষা—আনন্দ—শান্তি। মৃত্যু শরীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়—কিন্তু মানুষের মনে এই সম্বন্ধগুলি অমর হইয়া রহিয়া যায়।

পরিবারকে আমরা যেন খাটো করিয়া না দেখি। পিতা-পুত্র, জননী-সন্তান, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী এই এই ভাবে মানুষ যেখানে মানুষকে পায়, পাইয়া পরম কৃতার্থতা লাভ করে—সেই স্থান এই পৃথিবীতে স্বর্গসমান। এই ভূস্বর্গে আমরা পাই অপূর্ব্ব সুযোগ নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিকাশ করিয়া তুলিবার। আমাদের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থরতা, আলস্য, দ্বেষ, দূর করিবার কতই না ক্ষেত্র পরিবার অহরহ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। পরিবারে আমাদিগকে সাধনা করিতে হয় ক্ষমা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, প্রীতি। না, পরিবারকে বন্ধন বলিও না। পরিবার মানুষকে উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছিবার সিংহদ্বার মুক্ত করিয়া দেয়।

তবে পরিবারে থাকিবার, পরিবারকে সুসংহত, কল্যাণপ্রসূ করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। সেগুলি সযত্নে শিখিতে হয়। পরিবারের মহৎ উদ্দেশ্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে ঐ নিয়মসমূহ আমরা অবশ্যই সানন্দে পালন করিয়া যাইব। আর যদি পরিবারকে নিজের খাওয়া, পরা, আরাম এবং আর পাঁচটা ব্যক্তিগত সুবিধা মিটাইবার জায়গা—এইরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে কোন নিয়মকানুনই আমরা মানিতে চাহিব না। তখন আমাদের পারিবারিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে শুধু নিজের স্বার্থান্বেষণ দ্বারা। এইরূপ ক্ষেত্রে পরিবারকে আমরা লইয়া যাই দুর্ব্বলতার পথে, ধ্বংসের পথে।

পরিবারের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলির যথাযথ মর্য্যাদা দেওয়া সর্বপ্রথম প্রয়োজন। ছেলেমেয়ে হইয়া জন্মাইলেই ছেলেমেয়ে হওয়া যায় না। পিতামাতার নিকট হইতে শুধু দাবী করিয়া যাওয়া সন্তানের ধর্ম নয়। সন্তানকে দিতে হইবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে জনক-জননীর গভীর মর্মবেদনা—স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে লইতে হইবে তাঁহাদের কৃচ্ছ্রতার, তাঁহাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার, তাঁহাদের তিলে তিলে আত্ম-বিসর্জনের ভাগ। প্রাচীনকালে শিক্ষালয়ে ঋষিরা দিতেন—

পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব।

পিতাই হউন তোমার উপাস্য দেবতা—মাতৃচরণে সম্মিলিত হউক অন্যান্য শত শত দেবতার প্রতি ভক্তি।

এই শিক্ষা শুধু পুঁথিতে রাখিবার শিক্ষা নয়। ইহা সমগ্র জীবনে নিষ্ঠার সহিত আচরণীয় শিক্ষা। আর যাহা কিছু শিখিয়াছ ভুলিয়া যাও, ক্ষতি নাই—কিন্তু এই শিক্ষাটিকে ভুলিও না।

যত বড় হও, যত দূরে যাও, যত জটিল পরিস্থিতিতে থাক না কেন—মায়ের মুখখানিকে ভুলিও না। মায়ের স্মৃতি জীবনের অক্ষয় রক্ষা-কবচ। বিপদে উহা দেয় হৃদয়ে বল, দুঃখে শোকে আনে স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, প্রলোভনে উহা জাগায় অপরাজেয় বিবেক। মা—মা—মা—এই কথাটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বিশ্বের সকল মন্ত্রের পাবন শক্তি। হও এই মহামন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক। শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্ম পিতার জন্য কি করিয়াছিলেন—সেই পুরাণ-কাহিনী আমরা যেন ভূয়োভূয়োঃ স্মরণ করি। পিতার মর্যাদা ইঁহারা চিনিয়াছিলেন। সেই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখিতে কঠিন স্বার্থত্যাগ হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের লাভ হইয়াছিল অপরিমিত চরিত্রবল, অদ্ভুত অনাসক্তি, বিশ্বমুগ্ধকর পৌরুষ।

ভাইবোনের মধুর সম্বন্ধটি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছ কি? সংসারের বহু বিচিত্র পথে এই সম্বন্ধের সহায়তা অসীম। কত না মোহ, কত না আবিলতা মানুষকে নানা সময়ে নানা দিক হইতে পরিবেষ্টন করিতে আসে। এই সম্বন্ধটির জোরে সে পারে নিজেকে অনেকাংশে বাঁচাইতে। যদি যথার্থ ভাই,

যথার্থ বোন হইতে পার তবে জীবনে এক বিপুল সম্পদ লাভ করিলে। স্বামী-স্ত্রী পবিত্র সম্বন্ধকে আমরা পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টি দিয়া যেন কখনও দেখিতে না যাই। এই সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া মানুষ কত মহৎ হইতে পারে, কত শক্তি, কত শুচিতা, কত ধৈর্য লাভ করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পুরাণ, ইতিহাসে ছড়ানো রহিয়াছে। এখনও ভারতের নরনারী এই সম্বন্ধকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া আসিতেছে। এই সনাতন পুণ্যভূমির জনপদে জনপদে এখনও রামসীতা, সাবিত্রী-সত্যবানের অনুকরণে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পতি-পত্নীরা অনুভব করে একটি স্বাভাবিক আগ্রহ। ভারতীয় পরিবারের এই লক্ষণটিকে আমরা যেন কখনও অবজ্ঞা না করি। বিশ্ব-সভ্যতাকে ভারত যাহা যাহা দিতে পারে তাহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শসম্বন্ধ অন্যতম। ভারতেই স্ত্রীকে বলা হইয়া থাকে সহধর্মিণী, পতি বিশেষিত হন দেবতা আখ্যায়। বিবাহের পথ এখানে বিলাস-ব্যসন, ভোগপরায়ণতার পথ নয়—আত্মত্যাগ, নিষ্কাম সেবা, নিঃস্বার্থ প্রেমকে মূর্ত করিয়া তুলিবার পথ—ক্ষুদ্র সুখকে ভুলিয়া বৃহত্তর কল্যাণকে অনুসরণ করিবার পথ। সংসার এখানে ধর্ম।

পরিবারের প্রধান সম্বন্ধগুলি ছাড়া আরও যে সকল সম্বন্ধে আমরা বহু নরনারীর সহিত বাঁধা থাকি সেগুলিও আমাদের জীবনে আনে প্রচুর সরসতা, প্রীতি, আনন্দ। কাকা-কাকী,

মামা-মামী, দাদু-দিদিমা, মাসিমা-পিসিমা, ভাইপো-ভাইঝি-ভাগিনেয় ইত্যাদি বড় ছোট আত্মীয়েরা আমাদের হৃদয়কে নানাভাবে ভালবাসা দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখেন। প্রত্যেকটি সম্বন্ধেরই স্বকীয় সার্থকতা আছে। প্রত্যেকটি সম্বন্ধকে আমরা যথাযথ মর্যাদা যেন দিতে পারি।

পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য পরিপালনীয় আর একটি নিয়ম হইতেছে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ। সকলকে সম্মান দিয়া, স্নেহ দিয়া, মনে মনে ভালবাসিয়াই তোমার কর্তব্য ফুরাইল না। ভালবাসাকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে কর্মে, সেবায়, স্বার্থত্যাগে। পরিবারকে সুসংহত রাখিবার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে কঠোর পরিশ্রম করিতে—ব্যক্তিগত আরামপ্রিয়তা, আলস্য, খেয়াল বর্জন করিয়া সংযত, কর্মতৎপর, সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। তোমার দিকে পিতামাতা চাহিয়া আছেন, ভাইবোনগুলি চাহিয়া আছে, আরও অসহায় কোন নিকট আত্মীয়-আত্মীয়া চাহিয়া আছেন। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তোমাকে সজাগ হইতে হইবে। পাশ কাটাইলে চলিবে না।

নিজেদের বাড়িটিকে নিখুঁত পরিচ্ছন্নতায় স্বচ্ছ করিয়া রাখ। অবসর সময়ে এক আধ ঘন্টা খাটিয়া ছোট একটি সবজিবাগান, ফুলবাগান তৈরী কর। বাড়ির শ্রী কত বাড়িয়া যাইবে। বাড়ির দারিদ্র, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা দূর করিবার জন্য সাহসে, উদ্যমে বুক বাঁধো। যতটুকু তুমি এখনই করিতে পার করিতে

পশ্চাৎপদ হইও না। চেষ্টা যত্নের ফল অমোঘ। বাকীটুকু তোমার বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমারই দ্বারা ক্রমশঃ সংসিদ্ধ হইয়া যাইবে—যদি পরিবারকে তুমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিয়া থাক—পরিবারের উন্নতি প্রাণে প্রাণে চাহিয়া থাক।

তোমার নিজের আচার ব্যবহার চরিত্রের উপর পরিবারের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা কতদূর নির্ভর করে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও। তোমাকে দেখিয়া ছোটরা শিখিবে, বড়রা ভরসা পাইবেন—তাঁহাদের কর্তব্য নিরূপণ করিবেন। হও পরিবারের একনিষ্ঠ সেবক। নিজেকে নিজের দেহমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিও না—ছড়াইয়া দাও পরিবারের দশজন ভালবাসার পাত্রের উন্নতি, সুখ ও শান্তির সংসাধনে।

প্রচুর ধন উপার্জনই পারিবারিক উন্নতির পরিমাপক নয়। দারিদ্র্যকে সর্বপ্রযত্নে দূর করিতে হইবে বটে কিন্তু বিত্তসঞ্চয়ের উগ্র আকাঙ্ক্ষাকে অবনমিত করিয়া। দশজনকে দাবাইয়া রাখিয়া ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক নিজের পুঁজি বাড়াইব—এই মনোভাব একটি ব্যাধিবিশেষ। এই ব্যাধি বাড়িয়া বাড়িয়াই তো সমাজে ধনতান্ত্রিকতা রূপ অকল্যাণের সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ ভারতের সুপুত্রসুপুত্রীগণ, তোমরা এখন হইতে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে সাবধান হও। টাকা রোজগার করিব—কিন্তু অপরকেও রোজগারের সুযোগ দিব—নিজে উঠিব, কিন্তু অপরকেও উঠিতে সহায়তা করিব—এই নীতিই অবলম্বনীয়।

সমাজ

পরিবারের পরে সমাজ। অনেকগুলি পরিবার লইয়া সমাজ গড়িয়া উঠে। আমি যেমন পরিবারের একজন, সমাজেরও তেমনি একজন। পরিবার হইতে যেমন আমার লইবার, এবং উহাকে দিবার আছে, সমাজ সম্বন্ধে সেইরূপ। সমাজের প্রতিও আমার দায়িত্ব কম নয়।

সমাজকে বাদ দিয়া পরিবার থাকিতে পারে না, আমিও পারি না। পরিবারের সুখদুঃখ, সম্পদবিপদ যেমন আমার বলিয়া মানি, সমাজেরও উন্নতি-অবনতি, স্বাচ্ছন্দ্য-দুর্যোগের দিকে আমাকে রাখিতে হইবে সজাগ দৃষ্টি। সমাজের কল্যাণে, পরিবারের কল্যাণ—আমারও কল্যাণ। সমাজের অধঃপতনে আমারও অধঃপতন।

'আগে চলো'—এই মন্ত্রে যদি দীক্ষা লইয়া থাকি—সেবা ও সহানুভূতি যদি চরিত্রে বরণ করিয়া থাকি তাহা হইলে সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি তাহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হইবে না। নিজকে স্বতঃই আমরা বিস্তার করিয়া চলিব নিকট হইতে দূরে—আরও দূরে—আরও দূরে। জাতিধর্মের বাধা, বিদ্যার ব্যবধান, ঐশ্বর্যের তারতম্য কিছুই আমাদিগকে গৃহের কোণে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। কবির মর্মগীতি আমাদেরও হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে :

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।

নিজের পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের অসুখ হইলে তাঁহাদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিতে যেমন যত্ন লই, দুঃস্থ সহায়সম্বলহীন প্রতিবেশীগণের পীড়াতেও আমাদের শক্তিসামর্থ্যানুযায়ী সেবা করিতে ছুটিয়া যাইব। দারিদ্র্য এবং বহুতর সামাজিক অন্তরায়ের জন্য যাহারা শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে না তাহাদিগের বিদ্যা-লাভের সহায়তা করিব। নিজের গৃহের পরিচ্ছন্নতার মত সমস্ত পল্লীর, গ্রামের পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত হইব। নিজেদের উদ্যোগে, পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়িয়া তুলিব সাধারণের জন্য পাঠাগার, শিল্পকেন্দ্র, আলোচনাসমিতি। মানুষের স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা যে সকল মনগড়া ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিব। সমাজ রূপ যন্ত্রটিকে চালাইবার জন্য এক এক জনকে এক এক কাজের ভার লইতে হয়—কিন্তু তাই বলিয়া এই কাজকে বড়, ঐ কাজকে ছোট বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। সমাজে ডাক্তারের, ইঞ্জিনিয়ারের, ব্যবসায়ীর যেমন প্রয়োজন আছে নাপিত-মিস্ত্রী-ঝাড়ুদার-মুটেমজুরেরও তেমনই প্রয়োজন। কেহ ছোট নয়। সকলকেই মানিতে হইবে, আদর করিতে হইবে—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ দিতে হইবে —এই সাম্য, এই উদার দৃষ্টিকে আমরা কেন্দ্র করিয়া চলিব।

একটি কথা আমরা যেন বিশেষ করিয়া মনে রাখি। গালা-গালি দিয়া, প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া, জোর করিয়া

চাপাইয়া সমাজ-সংস্কার হয় না। যে সকল সামাজিক আচার ও ব্যবস্থাকে অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিব উহাদিগকে দূর করিতে হইবে সমাজের লোকদিগকে ধীরভাবে বুঝাইয়া, যাহারা নিপীড়িত— শিক্ষা, সহানুভূতি দ্বারা তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া। চোখ যদি খুলিয়া যায়, প্রয়োজন বোধ যদি প্রবল হয় তাহা হইলে সংস্কার আসিতে দেরী হয় না। শরীরের রক্ত যদি সতেজ থাকে তাহা হইলে ব্যাধি যেমন দাঁড়াইতে পারে না—সেইরূপ সমাজের লোকের হৃদয়ে বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির যদি যথার্থ উন্মেষ হয় তাহা হইলে সামাজিক কুপ্রথাগুলিও ক্রমশঃ আপনা হইতেই তিরোহিত হয়। বাহিরের দু একটা সাময়িক প্রলেপ দিয়া সমাজের ব্যাধি আরাম করিবার চেষ্টা না করিয়া সমাজ-দেহের রক্তকে বলবান করিবার দিকে যত্ন লওয়া উচিত। সমাজের কতকগুলি ব্যবস্থা বর্তমানের পক্ষে মঙ্গলকর না হইলেও এককালে হয়তো উহাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল এবং উহারা সমাজের অনেক উপকারও সাধন করিয়াছিল। হয়তো তখন সেগুলি এ আকারে ছিল না। তখন উহাদের রূপ ছিল কল্যাণকর, প্রয়োগ ছিল বিবেকসঙ্গত। ক্রমশঃ মানুষের স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ঐ ব্যবস্থাগুলিকে উত্তরোত্তর নিজেদের সুবিধামত বিকৃত করিয়া বর্তমান জঘন্য অবস্থায় পরিণত করিয়াছে। অতএব আমরা যখন ঐ ব্যবস্থাগুলিকে আজ দূর করিতে যাইব তখন বিদ্রোহীর মনোভাব না আনিয়া যেন সহানুভূতির সহিত কার্যসিদ্ধিতে অগ্রসর হই।

প্রত্যেক জাতির জীবনধারায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সমাজসংস্কারের সময় ঐগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। পাশ্চাত্য সমাজের হুবহু অনুকরণ করিয়া ভারতীয় সমাজের কল্যাণ হইবে না। ভারতীয় জাতির মূল ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাশ্চাত্যের ভাল জিনিষগুলি আমরা লইব। 'যাহা কিছু প্রাচীন সব কুসংস্কার'—এই মনোভাব অতি মারাত্মক। গভীর চিন্তাশীলতা ও শ্রদ্ধা লইয়া প্রাচীনকে বিচার করিতে হইবে—প্রখর সতর্কতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লইয়া নবীনকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীনের অ হইতে বিসর্গ পর্যন্ত সবটাকে নির্বিচারে আঁকড়াইয়া রাখিবার মত গোঁড়ামি আমাদের থাকিবে না—আবার আমেরিকায় এইরূপ হইতেছে, রাশিয়ায় ঐরূপ চলিতেছে বলিয়াই আমরা উহাদের আইন কানুন আদ্যন্ত এদেশে আমদানি করিতে যাইব না। প্রাচীন ও নবীনের সুষ্ঠু ও সঙ্গত সামঞ্জস্য হইবে আমাদের সমাজের লক্ষ্য।

জয় হিন্দ

আসমুদ্র হিমাচল এই বহু বৈচিত্র্যময় বিশাল দেশকে ভারতের নরনারী যুগ যুগ ধরিয়া যে শ্রদ্ধা, যে ভালবাসা দিয়া আসিয়াছে তাহা যেন আজ এক নবীন জাগ্রত রূপ লইয়াছে 'জয় হিন্দ্' এই শব্দ দুইটির মধ্যে। হিন্দ্-এর জয় হউক। অনেক উত্থান-পতন, আশা-নৈরাশ্য, সুখ-দুঃখে সংগ্রথিত হিন্দুস্থানের সহস্র সহস্র বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস সমাপ্ত হইয়া যায় নাই—উহার নূতনতর, উজ্জ্বলতর অধ্যায় লেখা শুরু হইয়াছে। হিন্দুস্থানের সম্মুখযাত্রা থামিয়া যায় নাই, অভিনব প্রাণশক্তি লইয়া সে চলিয়াছে—নূতনতর বিজয়-পথে। সেই উত্থান সার্থক হউক, সেই বিস্তারের সকল বাধা অপসারিত হউক, হিন্দ্এর জয় হউক।

কিন্তু এই জয়গানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারি হিন্দ্এর—এই সুবৃহৎ ভারতভূমির যথার্থ পরিচয়। ভারতবর্ষকে জানা মানে ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্যকে জানা—তাহার চিন্তাধারা, জীবনধারা কোন চরম পরিণতির অভিমুখে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানা—

বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতীয় জাতির বিশেষ অবদান কি—তাহা জানা। ভারতের নদনদী, গিরিউপত্যকা, অরণ্যজনপদের স্বকীয় সৌন্দর্য আছে—ভারতের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমির নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে। কিন্তু ভারতের জয়গান উহাদের জন্যই নয়। ভারতের জয়গান তাহার শত শত শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য—যাঁহারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এক অভিনব কল্যাণময় ভাস্বর জীবনাদর্শ। সেই জীবনাদর্শের অনুসরণে সকলেই যেন এক—একই রাগিণী যেন সকলের প্রাণকে অনুক্ষণ রাখিয়াছে মাতাইয়া। সেইখানেই যেন ভারত-ভারতীর মুখ্য স্বরূপটি জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই যেন সকলে ভারতীয়। সেই বৈশিষ্ট্য—কী সেই লক্ষ্য—কিরূপ সেই আদর্শ ?

শাশ্বত সত্য, সার্বজনীন মঙ্গল, চিরন্তন সুন্দরের উপর নিষ্ঠা ও অনুরাগই ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য। যাহা দুদিন স্থায়ী—বিনশ্বর, যাহা মাত্র অল্প কয়েকজনের স্বার্থ সিদ্ধ করে—যাহা শুধু বাহিরের একটা মিথ্যা চাকচিক্য দ্বারা শরীরমনকে ভুলাইতে চায়—এমন বস্তুর দিকে ভারতবাসীর অন্তরাত্মা কখনও তদ্গত হইয়া ছুটে নাই। সে একান্তভাবে খুঁজিয়াছে বড়—বড়—তাহার চেয়েও বড়—সকল বস্তু, সকল সম্পদ, সকল সত্য, সকল ভালবাসার চেয়ে মূল্যবান—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—ভূমাকে। জগৎকে সে অবহেলা করে নাই কিন্তু জগতের প্রতিটি আচরণের মধ্যে এই সর্ব-মহত্তম বস্তুর অনুশীলনকেই

করিয়াছে সে তাহার জীবনাদর্শ। এই আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, বিদ্যায়, শিল্পে, কাব্যে, সঙ্গীতে—জীবনের প্রত্যেক স্তরে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন হিংসা, লোভ, বর্বরতায় মত্ত, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ছাড়া জীবনের অন্য কোন উচ্চতর লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন—ভারতের আকাশ ছিল তখন প্রেম, শান্তি, ও মৈত্রীর স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

আমাদের এই পুণ্য দেশ দর্শন, আধ্যাত্মিকতা এবং নীতি-বিজ্ঞানের প্রসূতি—মাধুর্য, ধৈর্য এবং প্রেমের জন্মভূমি। কিম্বদন্তীও যে দূর অতীতের কুয়াসা ভেদ করিতে সাহসী হয় না—সেই সময় হইতে এখন পর্যন্ত চিন্তার পর চিন্তাপ্রবাহ ভারত হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেকটিরই পিছনে ছিল আশীর্বাণী, আর সামনে ছিল শান্তি। অমূল্য ভাবসমূহের জন্ম দিয়া ভারত তাহা সারা জগতে অকৃপণভাবে বিলাইয়া দিয়াছে। ভোরের মৃদু শিশিরকণা যেমন সকলের অসাক্ষাতে পড়িয়া মনোরম গোলাপের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইয়া তুলে, জগতের চিন্তা-ধারার প্রতি ভারতের দানও ঠিক সেইরূপ। নীরবে, অলক্ষ্যে অথচ প্রচণ্ড কার্যকারিতা লইয়া ইহা পৃথিবীর চিন্তাধারার উপর বিপ্লব সঞ্চার করিয়াছে—কেহই কিন্তু জানে না কখন ইহা ঘটিল। মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রবুদ্ধ করা—

পশুমানবকে দেব-মানবে পরিণত করা—ইহাই ভারতের মূল জীবনব্রত, তাহার অস্তিত্বের চরম সার্থকতা। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি তাহার ভৌগলিক সংস্থানের জন্য নয় কিংবা ভারতের মাটিতে আমার জন্ম হইয়াছে বলিয়া নয়—ভালবাসি, ভারত শত শত বিপ্লবময় যুগের মধ্য দিয়া তাহার মহাপ্রাণ সন্তানগণের জ্ঞানদীপ্ত এই জীবন্ত বাণীগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়া ঃ

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ—ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ—ব্রহ্ম অনন্ত।

শান্তং শিবং অদ্বৈতম্

শান্তিই ব্রহ্ম—মঙ্গল ব্রহ্মেই—ব্রহ্মেই সকল প্রাণীর একত্ব।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি-ধর্ম-শিক্ষা।

প্রাচীন ভারত ভূমা জ্ঞান ও শান্তির আদর্শে জীবনকে কেন্দ্রীভূত করিলেও ইহলোকের নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের

অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ছিল না। জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসা, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত এবং নানাপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতীয়দের পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। এদেশের এবং বিদেশেরও বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের গবেষণার ফলে ভারতীয় জাতির বিগত কীর্তি-কলাপের পরিচয় ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছে। ভারত এতদিন ইংরাজের অধীন ছিল। পরাধীন জাতির যথার্থ ইতিহাস অন্বেষণ করিবার বাধা এতদিন ছিল অনেক। তাই বৈদেশিক পণ্ডিতগণের অনেকে ভারতের অতীত ইতিহাসের উপর যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। কালের চক্র আজ ঘুরিয়াছে। হিন্দ এখন স্বাধীন। এখন ভারত-ইতিহাসের অনাদৃত এবং লুপ্ত গৌরবময় অধ্যায়গুলির ধীরে ধীরে উদ্ধার হইবে। আমরা দেখিতে পাইব বহু ভুল, ত্রুটি, গ্লানি, অপমান ও কলঙ্ক সত্ত্বেও আমাদের জাতীর অতীত এক মহিমান্বিত কাহিনী। বিপুল মনীষা, শৌর্য, বীর্য, আত্মত্যাগ, প্রেম ও পুণ্যে সে-গাথা ভরপুর। আমরা ধন্য যে আমরা ভারতীয়।

অবশ্যই আমরা প্রচীনকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিব না। আমাদের জয়গান যে প্রাচীন মহিমার আদি ষড়জ্ স্বরের সহিত অনাগত উৎকর্ষের ছয়টি স্বরু মিলাইয়া। দীপ্ত পৌরুষে, অদম্য সাহসে, অবিচলিত বিশ্বাসে আমরা চলিব—চলিব—অভূতপূর্ব আগামী গৌরবকে উপলব্ধি করিতে। ভারতের ভাগ্য-

বিধাতা পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে এই বর্তমানে লইয়া আসিয়াছেন। ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথ কাটিয়া গিয়াছে। চিরসারথির রথচক্র আবার ভারতের যাত্রীকে লইয়া যাইবে সম্মুখে—সম্মুখে—ভাস্বর সম্মুখে।

ভারত একটি উপ-মহাদেশ। ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী, ধর্ম, খাদ্য-পরিচ্ছদ, আচার এবং সামাজিক রাজনীতির বহুতর বিভিন্নতা ভারতের বহু কোটি নরনারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিবার পক্ষে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে ভারতীয় জাতির জীবনধারা বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে ঐ ধারণা ভুল। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও আছে এক নিবিড় ঐক্য।

সমগ্র ভারতীয় জাতির জীবন-লক্ষ্য যে এক। এই জীবন লক্ষ্যের দিকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতেছে—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। উদ্দেশ্য এবং আদর্শের একতা—প্রাণের একতা—চিন্তাধারার একতাই তো আসল একতা।

এই গভীর ঐক্যের কথা ভাবিয়া আমাদিগকে আজ অবান্তর পার্থক্যগুলিকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী মনোভাবগুলি

নির্মমভাবে বিসর্জন দিতে হইবে। বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, তামিল, মালাবারী—আমরা সকলেই ভারতীয়—এই বোধে আমাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। প্রদেশের ভাষা, আচার, খাদ্য, বেশভূষা সংরক্ষণ কর কিন্তু প্রদেশের ছাপ ছাড়াইয়া আমাদের যে বৃহত্তর পরিচয়—আমরা এক ভারতভূমির সন্তান—ইহা কখন ভুলিয়া যাইও না। পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা, অসূয়া, ঘৃণা চিরকালের মত যেন আমরা ত্যাগ করিতে পারি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, খৃষ্টান—সকলেই ভারতীয়। ধর্মের সাধনা পৃথক হইলেও ভারতীয় জাতির জীবন-সাধনায় সকলেরই মধ্যে যেন থাকে গভীর ঐক্য।

'আমরা ভারতীয়'—এই গর্বই যেন আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ গর্ব হয়। বাহিরের যাহা ভাল—শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কৃষি, সমাজ-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য দেশের উন্নত ব্যবস্থা এবং শিক্ষাগুলি আমরা আবশ্যক মত গ্রহণ করিব—কিন্তু ভারতীয় ভাবে ঢালাই করিয়া। ঐগুলি আমদানির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বৈদেশিক কুনীতিগুলিকেও যেন আমন্ত্রণ করিয়া না আনি। আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যেন কখনও আমরা হারাইয়া না ফেলি।

ভারত অন্যান্য দেশকে দিবেও অনেক। শিল্প বাণিজ্যের বা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দান তো গৌণ। ভারতের

প্রধান দান হইবে সত্য, সংযম, শান্তি, প্রেম, মৈত্রী, সুনীতি, সদাচার, প্রভৃতি মহত্তর আদর্শগুলির তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশল। উচ্চ আদর্শ শুধু পুঁথির আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জীবনের প্রতি চিন্তায়, প্রতি আচরণে কি করিয়া রূপ নেয় তাহা দেখিতে হইলে বিশ্ববাসীকে তাকাইতে হইবে ভারতের দিকে।

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান যুগে যুগে বিশ্বের নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া মানুষের চিন্তাধারা, জীবনধারাকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাহিরের রাজ্যবিজয় ভারত যে একেবারে করে নাই তাহা নয়—কিন্তু উহা কখন ভারতশক্তির মুখ্য লক্ষ্য ছিল না। তাহার বিজয় মানুষের মনোরাজ্যে, হৃদয়রাজ্যে। হিন্দ্‌এর সংস্পর্শে আসিয়া গ্রীস, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, আরব, মালয়, ইন্দোনেসিয়া, তিব্বত, চীন প্রাচীনকালে নানা দিক দিয়া উপকৃত হইয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞান আজ পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে ব্যবধানও অনেক কমাইয়া দিয়াছে। আজ পারস্পরিক যোগাযোগ অতি সহজসাধ্য। হিন্দ্‌ কি এই সুবর্ণ সুযোগে মানুষকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, শান্তির পথে লইয়া যাইবার জন্য তাহার অমূল্য ভাবসম্পদ, চরিত্রসম্পদ্‌কে দিকে দিকে বিতরণ করিতে ব্রতী হইবে না?

ধর্ম

ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

ধর্ম মানুষের জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—অথচ এই জিনিষটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই এত অল্প ও অস্পষ্ট থাকে যে ধর্ম আমাদের পক্ষে উপেক্ষার বস্তু হইয়া পড়ে। অনেক সময়েই আমরা ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মনগড়া অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া লই—ভাবিয়া দেখি না, উহাদের কোন ভিত্তি আছে কি না। আদি অন্ত ভাল করিয়া অনুসন্ধান করি না বলিয়া ধর্ম মানে বুঝি একটা আবছায়া কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কারের সমষ্টি—যাহার উৎপত্তি মানুষের দুর্বলতা হইতে, স্থিতি অন্ধবিশ্বাসে এবং পরিণতি নৈতিক ও ঐহিক অধঃপতনে। বলিয়া বেড়াই—ধর্ম একটা মিথ্যা মোহ—ভণ্ডামি। দাবী করি মানুষের সমাজ হইতে ধর্মের চিরনির্বাসন। মন্দির-মসজিদ্-গির্জা জাগায় না আমাদের প্রাণে কোন শ্রদ্ধা—দেবদেবী, পূজাঅর্চনা, সাধুসন্ন্যাসীর পরিবেশে চিত্তে উদ্রিক্ত করে না কোন আবেগ।

ধর্মের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের কারণ কি? ধর্মের যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে আমাদের উৎসাহ হয় না কেন? কারণ বোধ করি এই যে—ধর্মের নাম করিয়া বহু অবাঞ্ছনীয় জিনিষ

সমাজে ঢুকিয়া গিয়াছে—ধর্মের নাম করিয়া বহু অযৌক্তিক দুর্বোধ্য আচরণ মানুষ অনবরত করিয়া চলিতেছে—ধর্মের মুখোস পরিয়া বিপুল স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, পাপ সমাজের বুকে বাসা বাঁধিয়াছে। সেইগুলি সর্বদা আমাদের চোখে আসিয়া ঠেকে—বই-এতে, সংবাদপত্রে অনবরত পড়িতে হয়—তাই আমাদের অন্তরাত্মা বিষাইয়া উঠে ধর্মের প্রসঙ্গে। স্বতঃই মনে হয়, 'ধর্ম' জিনিষটি হইতে মানুষ যদি নিজেকে মুক্ত করিতে পারিত তাহা হইলে বোধ হয় মানবসমাজের এই সব নিরর্থক বিড়ম্বনা ঘটিত না।

এইখানেই আমরা একটা মস্ত ভুল করিয়া বসি। হাতুড়ে বৈদ্যের নিস্ফল তুক্‌তাক্ দেখিয়া চিকিৎসা জিনিসটির উপর যেমন আমাদের বিতৃষ্ণ হওয়া উচিত নয়, উন্নত বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারকে ব্যাপক ধ্বংসের কাজে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়া বিজ্ঞানকে যেমন আমরা বর্জন করিবার সঙ্কল্প করি না—সেইরূপ ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত অনাচারগুলির জন্য ধর্মকে দায়ী করা উচিত নয়। ধর্মের বিকৃত অভিব্যক্তিগুলিকে ধর্ম বলিয়া মনে করা ভুল এবং ঐ জন্য ধর্মকে গালি দেওয়া আরও ভুল।

কোন জিনিযকে বুঝিতে হইলে কেবল মাত্র উহার অপপ্রয়োগগুলিকে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়, ঠিক ঠিক খাঁটি প্রয়োগগুলির অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যে জিনিষ যত সত্য, যত শক্তিমান, দুষ্ট লোক তাহার নাম করিয়া তত

বেশী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কৌশল আবিষ্কার করে। ইতিহাসের দূরতম প্রান্ত হইতে ধর্মের ছলে মানুষের চিন্তায়, আচরণে, জীবনগতিতে নানা মলিনতা, দুর্বলতা, বাধা পুঞ্জীভূত হইয়াছে সত্য কিন্তু এই সত্য প্রমাণিত করে মানুষের জীবনের সঙ্গে ধর্মের একটি গোপনতম দূরতিক্রমনীয় সত্যসম্বন্ধ। ধর্মের সেই সত্যরূপটিকে চিনিতে হইবে, উহার কুয়াসামুক্ত স্বচ্ছ পরিচয় আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে।

ধর্ম কি

মানুষের জীবনে যাহা তুচ্ছ—যাহা নশ্বর, যাহা মলিন এবং মিথ্যা তাহাকে পরাহত করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত, অমরত্ব, উজ্জ্বলতা এবং সত্যকে যাহা প্রকট করে, সংরক্ষণ করে তাহারই নাম ধর্ম। ধর্মই মানুষকে—আসল মানুষকে ধরিয়া রাখে। উহাই মানবত্বের মেরুদণ্ড। ধর্ম না থাকিলে মানুষ হইয়া যায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন, পরস্পর অসংলগ্ন শক্তির গুচ্ছমাত্র। জীবনে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না—সে তখন মানুষ নয়—পশুজগতের উচ্চস্তরের জীবমাত্র।

ধর্ম মানুষের বাহির হইতে আমদানী করা কোন জিনিষ নয়। উহা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে—উহাকে সঙ্গে লইয়াই মানুষ পৃথিবীতে আসে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য জৈবিক তৃষ্ণা যেমন মানুষের জন্মগত

সাথী—ধর্মও সেইরূপ। তবে ধর্ম নানা কারণে চাপা পড়িয়া থাকে—ঘুমাইয়া থাকে। চেষ্টা যত্ন দ্বারা উহাকে প্রকাশ করিতে হয়, জাগাইতে হয়। ধর্ম যখন জাগে তখন উহা হয় মানুষের জীবনের এক পরম কল্যাণময় মহাশক্তি। উহার প্রকাশে মানুষ হয় দেবতা। বাক্যে, চিন্তায়, কর্মে সে বিকীরণ করে শুচিতা, শান্তি, মঙ্গল। ধর্ম মানুষকে নির্ভয় করে, উদার করে, প্রেমিক করে। উহা মানুষের জীবনের গভীরতম উদ্দেশ্যকে করে সার্থক।

ধর্মের উৎপত্তি

মানব-সভ্যতার অন্যান্য শাখার যেমন এক একটি ধরাবাহিক ইতিহাস আছে, ধর্মের ক্রমাভিব্যক্তিরও তেমনি সুস্পষ্ট ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। মানুষ একদিনে ধর্মকে আবিষ্কার করে নাই—ধর্মের যথাযথ স্বরূপ একদিনে ফুটিয়া উঠে নাই। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইয়াছে—বহুযুগের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারই অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন মহাশক্তির সন্ধান সে পাইয়াছে—ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে।

মানুষ যখন বনের পশুদের সহিত জঙ্গলে, পর্বতগুহায় বাস করিত তখন তাহার জীবন বলিতে সে বুঝিত শুধু দেহের জীবন। জঙ্গলের নিয়মেই সে চলিত। মানসিক জীবন, নৈতিক জীবনের কোন কথাই তখন উঠিত না। ক্রমে

সে চিন্তা করিতে শিখিল—নিজেকে চিনিতে শিখিল। পরিবার, সমাজ, নীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও তাহার জীবনে উঁকি দিতে আরম্ভ করিল। উহার প্রথম অভিব্যক্তি হইল একটা বৃহত্তর নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষায়। মানুষ চায় বাঁচিতে, তাহার পরিবারবর্গকে বাঁচাইয়া রাখিতে—চায় স্বাস্থ্য, চায় সুখ, চায় শত্রুর দমন। অথচ দশ দিকে প্রকৃতির কঠিন ভ্রূকুটি—জীবন সংগ্রামে পদে পদে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। যেটুকু শক্তি তাহার আছে, যেটুকু নিরাপত্তা সে পাইয়াছে তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। তাই নিযুক্ত হইল সে অদৃশ্য শক্তির উদ্বোধনে। জল, বায়ু, তেজ, বিদ্যুৎ, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্তা নানা দেব দেবী আবির্ভূত হইলেন মানুষের কল্পনায়। চেষ্টা চলিল তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবার। আসিল মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ, নানা ক্রিয়াকর্ম, স্তবস্তুতি, উপাসনা। জৈবিক প্রয়োজনের পরিপূর্তির জন্য এই যে অলৌকিক শক্তির উদ্বোধন—ইহা ধর্মের আসল স্বরূপ হইতে অবশ্যই বহুদূরে। কিন্তু তবুও ইহা মানুষের জীবনে আনিয়াছিল বহু সার্থকতা—পরিতৃপ্তি। অন্ততঃ সে এইটুকু বুঝিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে সে তাহার শক্তিকে বাড়াইতে পারে—বন্ধন দেখিয়া, বাধা দেখিয়া, ভয় না পাইয়া উহাদিগকে দূর করাই তাহার অগ্রগতির একমাত্র উপায়।

আর একটি দরজা দিয়া ধর্ম মানুষের নিকট উপস্থিত

হইয়াছিল—মানুষের মনের আদিম বিস্ময়। প্রাচীন মানুষ যে দিকেই তাকায় দেখিতে পায় দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। দিক্‌চক্র উদ্ভাসিত করিয়া উঠে সূর্য্য—দিবালোকে দশ দিক উজ্জ্বল হয়, জীবজন্তু কীটপতঙ্গ সব মহোদ্যমে প্রাণনির্বাহে লাগিয়া যায়। আবার দিনশেষে সে হয় অদৃশ্য—কোথায় যায় কে জানে? আসে অন্ধকার—প্রাণীরা সব ঢলিয়া পড়ে নিদ্রার কোলে। রাত্রে আকাশে জ্বলে চাঁদ—অগণ্য তারা—সূর্য উঠিলে আবার তাহারা লুকাইয়া পড়ে। দিনের পর দিন চলে—এই আসা যাওয়া, আঁধার আলোর খেলা। আসে ঋতুর চক্র—আনে আকাশে, বাতাসে, মাটিতে বিচিত্র পরিবর্তন—শীত, গ্রীষ্ম, মেঘ, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ। পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার গা ফাড়িয়া ঝরণা ছুটিতেছে। সমতল ক্ষেত্রে দূর দূরান্তরের বন প্রান্তর পার হইয়া বহিয়া চলিতেছে নদী। পারাবারহীন সমুদ্র, ধূ ধূ ঊষর মরুভূমি। ধরণীর পৃষ্ঠে অসংখ্য প্রাণি-নিবহ। তাহাদের জন্ম-মৃত্যু-বিস্তার, মিলন-সংঘর্ষ—তাহাই বা কি অদ্ভুত। আদিম মানুষ ভাবিয়া ভাবিয়া কূল পায় না। একটা অজানার স্পর্শ তাহার হৃদয় মনকে করিয়া তোলে বিস্মিত, আলোড়িত। কি এ, কি এ! এই বিস্ময়ের সমাধান সে তাহার বুদ্ধি ও ধারণা-শক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী নানাভাবে করিল। প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে সে জুড়িয়া দিল এক এক জন দেবতা।

জন্ম নিল নানাপ্রকার বিশ্বাস। দেবতাদের সঙ্গে ভূতপ্রেতও দেখা দিল। ইহকালের পাশে পরকাল আসিয়া হাজির হইল। পরকালের সুখ এবং শান্তি দুইই মানুষের চিন্তাকে অধিকার করিল। পরকালের জন্য ইহকালে করণীয় কাজ বাড়িয়া গেল।

আরও একটি দিক হইতে ধর্মের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল —মানুষের স্বাধীনতা বোধ। এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ আছে—যে আনন্দ মানুষ বোধ করিতেছিল তাহার শিরায় উপশিরায়—প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসে—হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার পথে এত প্রতিবন্ধক কেন? আছে প্রকৃতির প্রতিকূলতা—আছে বহুবিধ শত্রু—আছে ব্যাধি, জরা। মানুষ আদিমকালেই অনুভব করিয়াছিল সৃষ্টি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি উগ্র বিদ্রোহ। সমস্ত প্রতিপক্ষতাকে দূর করিবার একটি জন্মগত অধিকার লইয়া সে যেন পৃথিবীতে আসিয়াছে। সে যেন কোন কিছুরই বশীভূত নয়—সে দুর্বার, অপরাজেয়, স্বাধীন। এই স্বাধীনতা-বোধ প্রকাশ পাইল" নানা ক্রিয়াকলাপ, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার চেষ্টায়।

নিজের একটা নিরাপদ অবস্থা খুঁজিয়া বাহির করা, বিশ্ব প্রকৃতির বিস্ময়কর ঘটনাগুলির কারণ অনুসন্ধান করা এবং প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা—এই তিন দ্বার দিয়া ধর্ম মানববুদ্ধিতে প্রবেশ লাভ করিল এবং

ইহার সমাধান-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন রূপ লইয়া তাহার চেতনার মধ্যে বিকাশ লাভ করিলে লাগিল। নিরাপদ অবস্থার অর্থ মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত অন্য প্রকার বুঝিতে লাগিল। শরীরের বিপদকে সে আর বড় করিয়া দেখিল না। শরীরের নিরাপত্তার জন্য তাহার নিজের ক্রমোন্নত বুদ্ধির আবিষ্কৃত বহুবিধ প্রতিকারের উপরই সে নির্ভর করিতে শিখিল—অলৌকিক শক্তির আহ্বানের প্রয়োজন কমিতে লাগিল। কিন্তু সেই ক্রমোন্নত বুদ্ধির কাছে আবার ধরা পড়িতে লাগিল তাহার জীবনের সূক্ষ্মতর অন্য বিপদ। নানাপ্রকার মানসিক সন্তাপ ও দুর্বলতা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এই সব শত্রুর প্রতিরোধের জন্য সে অন্যপ্রকার শক্তির প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিল। যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের স্তর অতিক্রম করিয়া ধর্ম রূপ লইল ইন্দ্রিয়নিগ্রহের, মনঃসংযম, আত্মপরীক্ষা, পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের।

তাহার বিস্ময়ও স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়কে অবলম্বন করিতে লাগিল। সমীক্ষণ শক্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সে ধরিতে শিখিল এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির বহু বিস্ময়ের অর্থ খুঁজিয়া পাইল। পদে পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাকে কল্পনা করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু

আসিতে লাগিল নূতন নূতন বিস্ময়—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতম প্রশ্ন। সুখ কি, দুঃখ কি—পরিবর্তনশীল সংসারে অপরিবর্তনীয় কিছু আছে কি না—মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার লক্ষ্য কি—এই বিশ্বসংসার কোথা হইতে আসিল—কে এখানকার শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে—জন্মমৃত্যুর রহস্য কি—ইত্যাদি জটিলতর প্রশ্নের সমাধান চেষ্টায় তাহার ধর্ম ক্রমে সূক্ষ্মতর ও উন্নততর রূপ ধরিতে লাগিল। তাহার চরিত্রে আসিল ধ্যানশীলতা, বিবেক, ভক্তি—অন্তরে আসিল সমস্ত বিস্ময়ের পরমকারণ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা।

স্বাধীনতা বোধও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকে অগ্রসর হইয়া ধর্মের অভিনব কল্যাণকর রূপান্তর সংসাধন করিতে লাগিল। বাহিরের প্রকৃতিকে অনুকূল করা বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্পাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই হইল কঠিনতর সমস্যা। এই বিজয়ের সাধনায় মানুষ ক্রমে আবিষ্কার করিল তাহার আত্মাকে। তাহার নিজের জন্ম-মৃত্যু-হীন চিরমুক্ত জ্যোতির্ময় অনন্ত আনন্দময় স্বরূপের পরিচয় পাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই আবিষ্কারের আনন্দে সে গাহিয়া উঠিল,—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

* * * * * *

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

জানিয়াছি, জানিয়াছি—সকল অন্ধকারের অতীত চিরভাস্বর সেই পরম পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই অজ্ঞান রূপ মহামৃত্যু হইতে নিস্তার পাওয়া যায়—মুক্তির আর কোন উপায় নাই।

ধর্মের প্রয়োজন ও লক্ষ্য

ধর্ম যখন এইরূপ কতকগুলি আদিম অন্ধবিশ্বাস, ভয়, কুসংস্কার এবং ক্রিয়াকলাপের পর্যায় হইতে চিরন্তন সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের প্রকাশক মহাশক্তি রূপে উন্নীত হইল তখন মানুষের জীবনের উপর উহার প্রভাব হইল অপরিসীম। ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থের পরিপূর্তির জন্য অবশ্যই উহার কোন উপযোগিতা নাই—কিন্তু 'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি'—চলো চলো, আগে চলো—এই মহামন্ত্র অনুসরণ করিয়া পরিপূর্ণতার স্বপ্নে যে মানুষ পাগল হইয়াছে—তাহার জীবনে ধর্মের প্রয়োজন হইল অপরিহার্য। জগতের মাটি কাঠ পাথর লইয়াই কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকিবে? পৃথিবীর নানা স্থূল ভোগে ব্যস্ত থাকিতেই কি তাহার জন্ম? শত সহস্র পুঁথির জ্ঞান আহরণ করিয়া, প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া, পরিবার প্রতিপালন করিয়া, যশোলাভ করিয়াই কি তাহার চলা শেষ হইবে? না-না-না।

মানুষের কানে যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সুদূর এক অজানা বাঁশীর সুর। উহা যেন নিরবধি বলিতেছে—রে মূঢ়, আয় আয়, আয়,—দেখ্ কত অপার্থিব রত্ন লুকানো আছে—লুটিয়া নে, লুটিয়া নে। কত উজ্জ্বল, কত সুন্দর, কত মূল্যবান। মানুষের চোখে যে ভাসিয়া উঠিয়াছে—ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন-প্রবাহের পশ্চাতে এক শাশ্বত সত্তার ছবি। মানুষকে ঐ আহ্বান শুনিতেই হইবে—ঐ ছবিকে মূর্ত করিয়া তুলিতেই হইবে। উপায়—ধর্ম। ধর্মকে দূরে রাখিলে মানুষ রহিয়া যায় অসম্পূর্ণ। ধর্মই যে মানুষকে লইয়া যায় শেষ লক্ষ্যে।

ধর্মের বাসা কিন্তু আকাশে নয়—এই অজস্র কর্তব্য, হর্ষবেদনা, সংঘর্ষসংগ্রামময় জীবনের মাঝখানে। এই জীবনকে সে প্রত্যাখ্যান করিবে না—করিবে রূপান্তরিত—স্থৈর্যে, ধৈর্যে, সমতায়, সত্যে, প্রেমে।

ধর্মের—আসল ধর্মের মধ্যে কোন আবছায়া নাই, জটিলতা নাই, দুর্বোধ্যতা, সঙ্কোচ নাই। উহা দিবালোকের মত স্বপ্রভ, নির্মল সলিলের মত স্বচ্ছ—আকাশের ন্যায় উদার।

ধর্ম জানে না কোন অনিষ্ট, হিংসা। উহা অবিরত অকাতরে বিলাইয়া যায় কেবল মঙ্গল। উহা শিব, উহা সুন্দর।

ভগবান

ধর্মের সহিত ভগবানের ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্য পৃথিবীতে এমন ধর্মেরও উৎপত্তি হইয়াছে যাহাতে আমরা

সচরাচর ভগবান বলিতে যাহা বুঝি সেইরূপ কোন ভগবানকে মানিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধর্মের মূল আদর্শ ইহাদের ঠিকই ছিল। অধিকাংশ ধর্মই ঈশ্বরের অস্তিত্ব গভীরভাবে মানে। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া ওঠে তাহাদের বিশ্বাস, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনধারা, সার্থকতা।

ভগবানের সম্বন্ধে নানা ধারণা মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। সেই সব ধারণার ভিতর কতকগুলি সাধারণ ঐক্য আছে। ভগবান তিনিই যিনি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং পরিশেষে বিনাশও করিতেছেন। তিনিই জগতের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। গ্রহ-তারা তাঁহারই অধীনে ঘুরিতেছে—তাঁহারই নির্দ্দেশে বায়ু বহিতেছে—সূর্য তাপ দিতেছে—তরুলতা, ফুল, ফল, ধরিত্রীর বক্ষে শোভা পাইতেছে—কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী যাবতীয় প্রাণী জন্মগ্রহণ করিতেছে—বাঁচিতেছে। ভগবান সর্বব্যাপী—সর্বত্র তাঁহার প্রকাশ; সর্বজ্ঞ—এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে; সর্বশক্তিমান—যেখানে যে কোন শক্তির অভিব্যক্তি দেখিতে পাই তাহা ভগবানেরই শক্তি। ভগবান ন্যায়ের মূর্তি। তাঁহার বিধানে কোন পক্ষপাত নাই, অবিচার নাই, বিশৃঙ্খলা নাই।

কোন কোন ধারণায় ভগবানের চিরন্তন সত্তা এবং জ্ঞানের দিকটিতে বেশী জোর দেওয়া হয়। যেখানে যাহা কিছু আছে

তাহা ভগবানের অক্ষয় অস্তিত্বেরই যেন খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তি। যেখানে যত কিছু জ্ঞান তাহা ভগবানের চিরভাস্বর জ্ঞানেরই যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা। তিনি নিজে অনন্ত সত্যস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ।

আবার ভগবানকে ভাবা হইয়াছে প্রেম ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া। মানুষের ভালবাসা সীমাবদ্ধ—ভগবানের ভালবাসায় কোন গণ্ডি নাই, কোন বাধা নাই। সংসারের যত কিছু আনন্দ ভগবানের অপরিমেয় আনন্দের যেন অস্পষ্ট ছায়ামাত্র।

ভগবান যেন মানুষের কাছে সকল পূর্ণতার সমষ্টি। অনন্ত তাঁহার গুণ। মানুষ যতই কল্পনা করুক, যতই বর্ণনা করুক উহার শেষ নাই।

ভগবানের রূপও নানাভাবে কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে তিনি অরূপ—কিন্তু তাঁহাকে চিন্তা করিবার সুবিধার জন্য মানুষ নানা দেবদেবীর মূর্তির মধ্য দিয়া তাঁহাকে সাকারভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে কত শত নরনারী ধর্মের মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ধন্য হইয়াছে।

কখনও কখনও আবার ভগবানকে নির্গুণ ভাবে ধরিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। যাহা কিছু বলা যায়, ভাবা যায় তাহা যেন ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের তুলনায় অতি সীমাবদ্ধ। তাই সকল ভাষা, চিন্তা, কল্পনা হইতে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি

সংসারের অতীত 'অবাঙ্‌মানসগোচরম্' পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাঁহাকে লইয়া এত কল্পনা, এত বর্ণনা, এত বিচার—তিনি কিন্তু এক। মানুষের প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্য অনুসারে ভগবানের ধারণাও অসংখ্য প্রকার হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাঁহাকে ঈশ্বর, আল্লা, গড্ যে কোন নামে, কালী, কৃষ্ণ, শিব ও রাম যে কোন রূপে মানুষ ডাকিতে, ভাবিতে পারে। পরস্পরের ধারণা ও মত লইয়া ঝগড়া ও মারামারি করা বিষম মূর্খতা।

ভগবানকে যেন আমরা শুধু একটা কল্পনা বলিয়া মনে না করি। তিনি সব চেয়ে বড় সত্য। সেই সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে—ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে—ইহাই সকল ধর্মের সার কথা। তাঁহাকে কাব্যের মধ্যে, মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। প্রতি চিন্তায়, প্রতি কার্যে তাঁহার স্পর্শ লাভ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাঁহার সহিত একটি নিবিড় ভালবাসার সম্বন্ধ। তবেই তো জীবন হইবে মধুময়, শান্তিময়, আনন্দময়।

ধর্মের সাধনা

চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে নানা বই পড়িলে এবং আলোচনা শুনিলেই যেমন ছবি আঁকা যায় না—কাগজ পেন্সিল রং তুলি লইয়া অনেক

অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পড়া থাকিলেই যথার্থ ধার্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম সাধনা করিতে হয়। যাঁহারা ধার্মিক বলিয়া জগতে পরিগণিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ধর্মকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা কত পরিশ্রম করিয়াছেন।

সুনীতি—ধর্মলাভের প্রথম সোপান। সত্য, পবিত্রতা, সংযম, নিঃস্বার্থপরতা—এইগুলি যে ভাল করিয়া পালন করিতে পারে তাহার পক্ষে ধর্মলাভ সহজ। কাহারও চরিত্রে যদি এই গুণ-গুলির শৈথিল্য লক্ষ্য কর তাহা হইলে সে যতই ধার্মিক বলিয়া জাহির করুক না কেন জানিবে সে প্রতারক।

ভগবদুপাসনা ধর্মের প্রধান সাধন। উপাসনা নানা প্রকারের। ভগবানের চিন্তা করা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা, তাঁহার সাকার মূর্তি বা নিরাকার স্বরূপের ধ্যান করা, পূজা করা, তাঁহার নাম বা মন্ত্র জপ করা, ভগবদ্বিষয়ক গান করা—এই সকলই উপাসনা। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে। নিজের নিজের ধর্মের উপদেশ অনুসারে এবং নিজের রুচি অনুযায়ী প্রত্যহ নিয়মিত কিয়ৎক্ষণ উপাসনার অভ্যাস করা উচিত।

ভগবচ্চিন্তার শক্তি অসীম। চিত্তের বহুমুখী চঞ্চলতাকে উহা শান্ত করে—বুদ্ধিকে নির্মল করে—হৃদয়কে উন্নত করে। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে জাগিয়া উঠে এক অপূর্ব শক্তি, অপার্থিব আনন্দ।

আমরা আমাদের পুঞ্জিত দুর্বলতা, কুটিলতা এবং আসক্তির দ্বারা ভগবান হইতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছি, প্রার্থনা উহা দূর করিয়া দেয়। যখনই আমরা প্রাণ উন্মুক্ত করিয়া নিজেদের দুঃখবেদনা, ব্যর্থতা, পরাজয়ের কথা অন্তরদেবতার কাছে নিবেদন করি—তাঁহার কাছে বল, বীর্য, সাহস ও উদ্দীপনা ভিক্ষা করি তখনই যেন আমাদের অতি সন্নিকটে আমরা প্রত্যক্ষ করি ভগবানের জাগ্রত সত্তা।

এই বৈদিক প্রার্থনাটি কি সুন্দর!

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

সত্য দেবতা আজি
মিথ্যা হইতে তারো।
তত্ত্বকিরণে জীবন-আঁধার
অপসারো, অপসারো ॥

এস এস এস হে জ্যোতির্ময়, অমৃতরে পেয়ে হোক মৃত্যুজয়,
হে রুদ্র, দানি করুণা দৃষ্টি সতত রক্ষা করো।

ধ্যানের দ্বারা আমরা ভগবানের অন্তরতম স্বরূপের পরিচয় পাই। চিত্ত একাগ্র হইলে সূক্ষ্ম বস্তু ধরিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা হয়। ধ্যানের শক্তিতে সাকার প্রতিমা চৈতন্যময় হইয়া জাগিয়া উঠেন—আবার আমাদের নিজেদের আত্মাতে নিরাকার পরমাত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আমরা ধন্য হই।

পূজা হৃদয়ের ভালবাসার একটি সহজ অভিব্যক্তি। ভগবানকে আমাদের পরমাত্মীয় জ্ঞানে পুষ্প, পত্র, গন্ধ, ধূপ, প্রভৃতি উপহার দিয়া তাঁহাকে আনন্দ দানের চেষ্টার মধ্যে লক্ষিত হয় একটি ঐশ্বর্যদৃষ্টিশূন্য সরল, স্বাভাবিক অনুরাগ। হইতে পারে উহা একটি মানবীয় ভাব। অনন্ত ভগবানকে পৃথিবীর সামান্য জিনিষ দিয়া তুষ্ট করিতে যাওয়া যেন তাঁহাকে ছোট করিয়া ফেলা—কিন্তু ভগবান যে চিরশিশু, হৃদয়ের আন্তরিকতা লইয়া যে ভাবেই আমরা তাঁহার সান্নিধ্য চাই সেই ভাবেই তিনি আমাদিগকে ধরা দেন। আমাদের কাছে 'ছোট' হওয়াতেই তাঁহার আনন্দ।

ভগবানের **নাম** করা তাঁহাকে স্মরণে রাখিবার একটি অনায়াস-সাধ্য উপায়। নামের ভিতর মহাশক্তি লুকানো থাকে। একাগ্র-ভাবে প্রীতির সহিত নাম করিতে করিতে সেই শক্তি জাগিয়া ওঠে—প্রেমে, শান্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

সঙ্গীতের সাহায্যে ভগবানকে ডাকা একটি অতি সরস সাধনা। পুরাণে নারদ ঋষির বর্ণনা কি হৃদয়গ্রাহী! ভগবৎপ্রেমে মত্ত হইয়া বীণাযন্ত্রে তাঁহার গুণগান গাহিয়া গাহিয়া তিনি ত্রিভুবন

ঘুরিয়া বেড়ান। নিজের তো পরিতৃপ্তি—আবার যে শোনে সেও হয় মুগ্ধ। মীরাবাই, সুরদাস, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কত সাধকসাধিকা ভজনগানের দ্বারা ঈশ্বরকে জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত ভজন সঙ্গীতগুলি আজও আমাদের প্রাণে জাগায় নির্মল ভক্তি, উদ্দীপনা।

দয়া ও পরোপকার, ধর্মলাভের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় সাধনা। হৃদয়ের যেখানে সঙ্কোচ, ধর্ম সেখান হইতে বহু দূরে। সমস্ত জীব ভগবানেরই সৃষ্ট—তাই জীবসেবা করিলে ভগবান প্রীত হন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

যিনি ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করিবেন তাঁহাকে অবশ্যই অহিংস হইতে হইবে। নিজের স্বার্থের জন্য কায়মনোবাক্যে কাহাকেও পীড়া না দেওয়ার নাম **অহিংসা**। তবে বহুর কল্যাণে দুষ্টকে শাস্তিদান অহিংসার বিরোধী নয়। সকল মানুষকে ভালবাসাই অহিংসার মুখ্য সার্থকতা। **ত্যাগ** ধর্মের প্রধান ভিত্তি। যিনি যথার্থ ধর্মলাভে উৎসুক, জাগতিক বিষয় ভোগ করিবার স্পৃহা তাঁহাকে কমাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ধর্ম—আলো ও

আঁধারের ন্যায় বিরোধী। ধর্ম আনিবে বৃহৎ জীবন। ক্ষুদ্রকে না ছাড়িলে বৃহৎকে পাওয়া যাইবে কিরূপে ?

ভগবানের জন্য পার্থিব সুখসম্পদ, মানপ্রতিপত্তি, এমন কি গৃহ ও পরিবারবর্গের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করার নিশ্চিতই গভীর সার্থকতা আছে। সকল দেশে, সকল ধর্মেই এই আদর্শের অনুসরণকারী শত শত নর ও নারী তাঁহাদের পবিত্র জীবন দ্বারা মানবের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম সাধনায় তাঁহারাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

ধর্ম যখন মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ ও সার্থক করিবার পক্ষে অপরিহার্য এবং উহা যখন আমাদের নিজেদের প্রকৃতিরই একটি প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশেষ—তখন উহা অভ্যাসের জন্য বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। বাল্যকাল হইতেই ধর্মের অনুসরণ করিলে সমস্ত জীবন কল্যাণময় হইয়া উঠে। অবশ্য বালকবালিকাদিগকে তাহাদের উপযোগী করিয়া ধর্ম শিখিতে হইবে।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষ

ধর্মের তত্ত্ব, মহিমা ও সাধনার বিস্তারিত উপদেশ যে—গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে তাহার নাম শাস্ত্র। নানা অবস্থায় মানুষের কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশও শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ধর্মকে জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই শাস্ত্রের প্রণেতা। শাস্ত্র শুধু কতকগুলি মন-গড়া

কল্পনার সমষ্টি নয়—প্রত্যক্ষ অনুভূতিই উহার ভিত্তি। কাজেই শাস্ত্রকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ধর্মেরই কতকগুলি প্রধান শাস্ত্র আছে—যেমন হিন্দুধর্মের বেদ, গীতা, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, খৃষ্টানের বাইবেল, ইসলামের কোরান। এই মূল শাস্ত্রগুলিকে অনুসরণ করিয়া পরে আরও অনেক গৌণ শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই বহু জ্ঞানগর্ভ কথা।

ধর্মের সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে শাস্ত্রের সহায়তা বড় কম নয়। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা জাগতিক নানা বিষয়কে বুঝিতে, ধরিতে সমর্থ হইলেও গভীর আধ্যাত্মিক সত্যকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। শাস্ত্র এই বিষয়ে দেয় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সত্যদ্রষ্টা, নিঃস্বার্থ, পরহিতব্রতী মুনিঋষিরা নিজেদের সাক্ষাৎ অনুভূতিসমূহই শাস্ত্রে সংগ্রথিত করিয়াছেন—এই বিশ্বাস যদি আমাদের থাকে তাহা হইলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারি। সেই শ্রদ্ধার ফলে আমাদের বুদ্ধি হয় নির্মল ও একাগ্র। নির্মল বুদ্ধি দ্বারা আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি।

শাস্ত্র নাটক নভেলের মত পড়িবার জিনিষ নয়। দু'চার বার পড়িয়া গেলেই উহার মর্ম বুঝা যায় না। গভীর মনোযোগ ও প্রীতি লইয়া বার বার পড়িতে হয়, ভাবিতে হয়—তবেই শাস্ত্রোক্ত সত্যের তাৎপর্য ধরিতে পারা যায়।

সকল মানুষের মানসিক সংস্কার এবং ধারণাশক্তি এক নয় বলিয়া ধর্মের সাধনা ও প্রয়োগও নানাভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রে তাই বিভিন্ন প্রকারের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—কখন কখন মনে হয় যেন উহারা পরস্পর-বিরোধী। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নয়। এক এক প্রকৃতির লোকের জন্য এক এক ধরণের ব্যাখ্যান দেওয়া হইয়াছে মাত্র—মূল তত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শাস্ত্রে আবার অনেক সময় অনেক কথা পাওয়া যায় যাহা বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে। এই সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখা উচিত যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হাজার হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল—বিশ্ব-প্রকৃতির ঘটনা-সমূহের কার্যকারণের জ্ঞান সেই সময়ে যতটা আবিষ্কৃত হইয়াছিল শাস্ত্রকাররা ততটুকুরই সহায়তা লইয়া ধর্মের তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা তো তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বুঝাইতে গিয়া উদাহরণ স্বরূপ জড়বিজ্ঞানের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র। সেই ঘটনাগুলি পরে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে অন্যরূপ প্রতীয়মান হইলেও ধর্মের তত্ত্বগুলির অসারত্ব প্রমাণিত হয় না। ধর্মের মূল সত্যের সহিত বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। বিরোধ কতকগুলি ব্যাখ্যান রীতিতে, কতকগুলি বাস্তব প্রয়োগে।

সামাজিক পরিবেষ্টনী, মানুষের শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানের ধারা

হাজার বৎসর পূর্বে যাহা ছিল আজ আর তাহা নাই। তখন মানুষের কর্মজীবনে যে সকল সমস্যা ছিল আজ আমাদিগকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তাই শাস্ত্রে আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে যে সকল বিধিব্যবস্থা আছে, সেগুলির সময়োপযোগী কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইতে পারে। ধর্মের আসল সত্য চিরন্তন। উহা সর্ব যুগেই সমান—উহার পরিবর্তনের প্রশ্ন নয়—লৌকিক জীবনে ধর্মের গৌণ প্রয়োগগুলি সম্বন্ধেই উপরোক্ত কথা। শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে অবিকৃত রাখিয়া অবান্তর বর্ণনা এবং বিধিব্যবস্থাগুলির এইরূপ কাটছাঁট করিতে আমাদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। উহাতে বরং আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে—ধর্মে ধর্মে বিরোধ কমিয়া আসিবে—ধর্মের মহিমা আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার সহায়তা হইবে।

যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেন যাঁহাদের জীবনে ধর্ম জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশ পায়। ইঁহারা যেন মূর্তিমান শাস্ত্র। ইঁহাদের জীবন দেখিলে ধর্মে, শাস্ত্রে বিশ্বাস আমাদের শতগুণ বাড়িয়া যায়। সংসারে বহুতর অন্ধকারের মধ্যে এই সব মহাপুরুষদের জ্ঞান-ভাস্বর জীবন মানুষকে দেখায় স্নিগ্ধ আলোক, তাহার প্রাণে আনে অমৃতের স্পর্শ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবন-

গাথায় ভরপুর। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এই পুণ্যভূমিতে সহস্র সহস্র নরনারী ধর্মকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মানিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন এবং ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষকে বলা হয় অবতার। ইঁহাদের পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম এবং আধ্যাত্মিক শক্তি এত বিশাল যে ইঁহাদিগকে মানুষ বলিতে সঙ্কোচ হয়। তাই আমরা ইঁহাদিগের নাম দিই ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বা অবতার। ইঁহারা ঈশ্বরের তুল্য আমাদের ভক্তি ও পূজার পাত্র।

মহাপুরুষ এবং অবতারগণের চরিত্র ও বাণী শাস্ত্রেরই মত ধর্মপথে আমাদের পরম হিতকারী। শ্রদ্ধার সহিত আমরা যেন উহা অনুসরণ করি।

ভবিষ্যতের ধর্ম

আদিম পার্বত্য জাতীয় লোকেরা গাছে ন্যাকড়া ঝুলাইয়া তল-দেশে কয়েকটি শিলা সাজাইয়া দেবতার আবাহন করে। গ্রামে কলেরা হইলে, বসন্ত হইলে আমাদের ঠাকুরমা পিসিমারা ওলাওঠাদেবী, শীতলাদেবীর পূজা দেন, মানত করেন। কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য মহাদেবের দরজায় 'হত্যা' দেওয়া বা অমুক দেবতার বালা বা মাদুলী ধারণ করা প্রভৃতি প্রথা এখনও বহুল প্রচলিত। এই সকল দৈব বিশ্বাস এবং আচারকে আমরা সচরাচর ধর্মেরই এলাকায় ধরিয়া থাকি।

ষষ্ঠী-মাকাল-শনি পূজা, নানারকমের ব্রত-নিয়ম-উপবাস, সিন্নি-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন—এগুলিকেও আমরা বলি ধর্ম। বিশেষ বিশেষ তিথিতে গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা, দান, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতিও ধর্মের মর্যাদা পাইয়া থাকে। জপতপ-শাস্ত্রানুশীলন-ভজন-কীর্তন-প্রার্থনা-ধ্যান এগুলি তো ধর্ম সাধনা বটেই।

মোট কথা সভ্যতার ঊষাকাল হইতে ধম যতগুলি ধাপের মধ্য দিয়া তাহার বর্তমান পরিশুদ্ধতম আকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই সব ধাপগুলিই যেন অল্পবিস্তর মানুষ এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে। ছোটখাটো উদ্দেশ্য হইতে মহত্তম উদ্দেশ্য—সকল কাজেই ধর্মকে লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। ধর্মের পরিধি আমরা এতদূর প্রসারিত করিয়া দিয়াছি, এত বিচিত্র বস্তু ও ব্যাপারের সহিত উহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছি যে অনেক সময় বুদ্ধি গুলাইয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা 'আধুনিক' মানুষ—দৃষ্টিভঙ্গি যাঁহাদের বিচার এবং বিজ্ঞানসম্মত, তাঁহাদের পক্ষে এই বহুরূপ, বহুশাখায়িত ধর্মের মূল্য নিরূপণ করা খুবই কঠিন। ফলে অনেকেরই মনে জাগে একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া। 'কাজ নাই বাবা, দূরে থাকাই ভাল'-নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ধর্ম হইতে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলেন।

ধর্মের ইতিহাস যদি আমরা অনুসরণ করিয়া থাকি, ধর্মের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা যদি বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে কিন্তু আমাদের বুদ্ধিবিভ্রমের কোন কারণ নাই। কোনটি ধর্মের প্রকৃত

উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে আর কোনটি ধর্মের ছায়ামাত্র—ইহা কি আমরা বাছিয়া লইতে পারি না? মানুষের মনের অসংখ্য স্তর—কাজেই তাহার বিশ্বাসেরও নানা বৈচিত্র্য।

ভবিষ্যতের ধর্মে আনিতে হইবে এইরূপ একটি উদারতা। ধর্মের মূল তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকল মানুষের সকল ধর্ম-প্রচেষ্টাকে স্বীকার করিতে হইবে, সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। সম্প্রদায় থাকুক—কিন্তু থাকিবে না সাম্প্রদায়িকতা; বৈচিত্র্যে আপত্তি নাই—কিন্তু বিদ্বেষকে করিতে হইবে বর্জন।

একথা অবশ্যই সত্য যে ভবিষ্যতের মানুষ দিনদিনই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ, লক্ষণ, প্রয়োজন এবং সাধনা সম্বন্ধে সচেতন হইবে। তাহার চিন্তাধারায় কোন হেঁয়ালি থাকিবে না। দৃষ্টি থাকিবে সত্যে, পবিত্রতায়, প্রেমে, বিশ্বমঙ্গলে। মানুষ মানুষকে চিনিবে 'অমৃতের সন্তান' বলিয়া। ধর্মের নিগূঢ় সত্য নিভৃত ধ্যানে উপলব্ধ হইয়া মূর্তি লইবে নিঃস্বার্থ কর্মে—জনগণের অকুণ্ঠিত সেবায়। ধর্ম মানুষের জীবনে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইবে—মানুষকে ধরিয়া থাকিবে। ধর্ম হইবে মানুষের 'আগে চলা'র শ্রেষ্ঠ সম্বল।